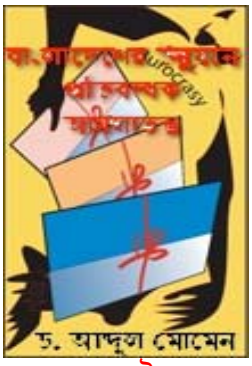

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রতিবন্ধক-আমলাতন্ত্র

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন

প্রকাশকঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রথম প্রকাশঃ
এপ্রিল-২০০২ইদ

দ্বিতীয় প্রকাশঃ
ইন্টারনেট এডিশন
মরুপলাশ ডট কম
নভেম্বর-২০০৬ইং
গ্রন্থ স্বত্ব ঃ
লেখক
প্রচ্ছদঃ
বদরুল আলম রতন
কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
লুবনা এবং জেকরা

Published by: Marupalash Group of Publications Dhaka, Bangladesh
E-mail : marupalash@gmail.com

উৎসর্গ

যে সব প্রবাসী বাঙালি ভাইবোনদের শ্রমের ফসলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, সেই সব খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে.....লেখক

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন একজন অর্থনীতিবিদ। এখানে (রিয়াদ, সউদী আরবে) তিনি মিনিষ্ট্রি অব ফাইন্যান্স এর একজন এডভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন প্রায় বছর তিনেক। এখানে তিনি ছিলেন একাই একশ' একটি সংগঠন, একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, একটি সাহিত্য সংসদ। তাঁর অবর্তমানে রিয়াদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতাঙ্গনে যে কুয়াসা নেমে এসেছে, তা আজও বর্তমান। ইতিপূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বষ্টনে ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতির একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিবাস নেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারে কাজ করেন। বাংলাদেশের ওয়েজ আর্নাস স্কীম এর উদ্যোক্তা ড. মোমেন আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশূ পাচার বন্ধে যে অবদান রাখেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে হিউম্যান রাইট্স- ১৯৯৪ এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত প্রশংসাও অর্জন করেন। তিনি একজন তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধকার হিসেবে দেশে বিদেশে এক বিশাল পাঠক প্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি রিয়াদের মরুপলাশ, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর সাহিত্য পত্রে নিয়মিত লেখালেখি করেন এবং দেশের জনপ্রিয় দৈনিক বাংলা এবং ইংরেজী পত্রিকাগুলোতে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি আমাদের চমকিত করে।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ
মোহনা, রূপসী চাঁদপুর
E-mail: marupalash@gmail.com

প্রবন্ধ ক্রমঃ

ড. ইয়াজউদ্দিন- জাতি চায় অবাধ-সুষ্ঠু-গ্রহণযোগ্য নির্বাচন
বাংলাদেশ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়
প্রবাসীদের প্রত্যাশা, আলোকিত বাংলাদেশ
একুশে ফেব্রুয়ারী ও নতুন শপথের ডাক
বাংলাদেশের সমস্যাঃ সন্ত্রাস, বিচার বিভাগ...
বাংলা নববর্ষঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোস্টনের ভূমিকা
হরতাল ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা
বাংলাদেশ ও আমেরিকাঃ দুই দেশে দুই নিয়ম
বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে ধর্মের আদব-কায়দা
মণীষী উপাখ্যান (ছোট্ট বন্ধুদের জন্য একটি বিশেষ রচনা)
বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ও পর্যটন শিল্প

ড. ইয়াজউদ্দিন- জাতি চায় অবাধ-সুষ্ঠু-গ্রহণযোগ্য নির্বাচন

বাংলাদেশে ১ম সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫সালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আশীর্বাদে। তবে অভ্যুত্থান ও মুজিব বংশ নিধনের প্রথম কয়েক মাস তিনি নেপথ্যে থেকে সরকার পরিচালনা করেন। প্রথমত: তিনি ক্ষমতা লিপ্সু ধান্দাবাজ খন্দকার মোস্তাক আহমদকে দিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল ও অকেজো করে তুলেন। তারপর তিনি বিচারপতি এ-এস-এম সায়েমের মতো একজন 'মেরুদন্ডহীন আজ্ঞাবহ' বিচারপতিকে দিয়ে নিজের অবস্থা সুদৃড় করেন। যখন জেনারেল জিয়া নিশ্চিত হলেন যে, তার প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণভাবে নি;চিহ্ন হয়েছে, পরপর ১৮টি অভ্যুত্থানের নায়কদেও ও তাদেও সহযোগীদেও হত্যা কার্যকর হয়েছে তখন তিনি সায়েমকে পাঁচা আস্তাকুড়ে ফেলে দেন। সায়েম রাষ্ট্রপতি বিতাড়িত হলে পর বর্তমানের 'বিব্রতবোধকারী' প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের বাবা জাষ্টিস এম হাসানের এক অনুষ্ঠানে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'কেমন আছেন? বল্লেন 'প্রাণে বেঁচে গিয়েছি-জিয়া সাহেব কাজ হাসিল করিয়ে আমায় ফেলে দিলো'।

আর এবারের অভ্যুত্থানের নেপথ্যে বেসামরিক কোনো যুবরাজের হাত আছে কিনা কে জানে। তাই যদি হয় 'ফেলে দেয়া নয়', জীবন বাঁচানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে বৈকি! জেনারেল জিয়া ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর ও বুদ্ধিমান লোক, তাই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি যা যা করার সব করেছেন, বহুলোককে এমনকি সামরিক বাহিনীর কয়েক শ লোককে এবং তার একান্ত ঘনিষ্ঠ কর্ণেল তাহেরকেও বিচারের প্রহসনে হত্যা করেন। আমার মনে পড়ে জেনারেল জিয়া 'ডি সি এম এল এ হবার পর সচিবালয়ের ডাবল প্রোটেকটেট এলাকায় বানিজ্যমন্ত্রীর রুমে (ইতিপূর্বে এই রুমে খন্দকার মোস্তাক ছিলেন) এসে বসার পর পরই তৎকালীন সময়ে বার্মায় কর্মরত জেনারেল মনজুরের সাথে ফোনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন। মনজুর ছিলেন তার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী। কিন্তু ভাগ্যেও কি নির্মম পরিহাস সেই জেনারেল মনজুরের হাতেই নাকি তার মৃত্যু হয়। বস্তুত: জেনারেল এ এইচ এম এরশাদ সরকার তাই আমাদের জানিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে জেনারেল জিয়ার একান্ত সহচর ছিলেন কর্ণেল ওয়ালী। আজ সেই কর্ণেল ওয়ালী বেগম জিয়া ও তার সন্তানের দল বি এন পি বিরোধী। তিনি বি এন পি র বিপরীতে নতুন দল এল ডি পি গঠন করেছেন।

বাংলাদেশে ২য় সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় জেনারেল এইচ এম এরশাদের নির্দেশে। জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর পর জাষ্টিস এম এ সাত্তার তার আজ্ঞাবহ হযে জাতির কাছে চিরদিনের জন্যে বেঈমান হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশীদের দুর্ভাগ্য যে, যাদের নিয়ে জাতির গর্ব করার কথা, যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখার কথা সেই সব

একাধিক প্রধান উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপতিবৃন্ধ নিজেদেও চারিত্রিক অক্ষমতা ও দুর্বলতার জন্যে নিজেদের ছল-চাতুরীর শিকার হয়ে আজ জনতার মঞ্চ থেকে নির্বাসিত। এমনটি তো হবার কথা ছিলো না।

নিজের ছল-চাতুরির জন্যে আজ প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান আস্তাকুড়ে, জনগন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ সেই পথে পরিচালিত হয়ে পরম নিন্দনীয হবেন না বলে আমার আশা।

তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে জাতির এই সন্ধিক্ষণে জাতিকে ভালো কিছু দান করার সুযোগ পেয়েছেন- এই সুযোগের সদব্যবহার করলে জাতি তাকে সশ্রদ্ধচিত্তে সালাম জানাবেন। চিরকালের জন্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। অপরপক্ষে প্রলোভন ও ভয়ভীতির বশবর্তী হয়ে তিনি যদি দলীয় উদ্দেশ্য হাসিলের ছল-চাতুরী অবলম্বন করেন, তাহলে তিনিও মীরজাফরের মতো ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিপতিত হবেন। জাতি তাকে বার বার ধিক্কার দেবে। সুতরাং 'আজ্ঞাবহ ও মেরুদন্ডহীন' এই অপনামের পরিবর্তে নির্ভীক, সাহসী ও সৎ শিক্ষকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করুন।

বিচারপতি সায়েম জেলনারেল জিযার টেনডন হিসাবে শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বেআইনি কাজ করে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। অধ্যাপক ইযাজউদ্দিন যদি সেই পথ অবলম্বন করেন তাহলে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রেও স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেবেন বৈকি। সাতান্নটি মুসলিম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে হাতেগোনা ক'টি মুসলিম দেশ এখনো গণতান্ত্রিক এবং এদের মধ্যে বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাকীগুলো হয় রাজতান্ত্রিক আর না হয় স্বৈরতান্ত্রিক। সুতরাং সাবধান ড. ইয়াজউদ্দিন- রাজতন্ত্রের পথ উন্মুখ করবেন না জনাব।

জাতির আজ সমূহ ভয়- এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি জাতিকে একটি 'অবাধ, সুস্থ, সুন্দর, রক্তহীন সর্বোপরি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবে? আজ ড. ইয়াজউদ্দিনের উপর নির্ভর করে প্রথমত: দেশের বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং দ্বিতীয়ত: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ভবিষ্যত। যদি তিনি বা তার উপদেষ্টা পরিষদ একাজে ব্যর্থ হন তাহলে জাতি তাদের ক্ষমা করবে না।

বাংলাদেশ আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়

বাংলাদেশের ৩০তম জন্মদিবসে বাঙালির গর্ববোধ করার অনেক কিছুই আছে। জাতি আজ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিন্জারের 'তলাবিহীন ঝুড়ি' (বোটমলেস্ বাস্কেট) আর নয়। সে বদনাম ঘুছিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় পৃথিবীর ত্রিশটি দেশ থেকে ও অধিক এবং পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ৫৫টি মুসলিম দেশসমূহের ৪৭টি দেশসমূহের বার্ষিক জিডিপি বাংলাদেশ থেকে কম। এমনকি তৈল সম্পদে ভরপুর নাইজিরিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্ক বা সিরিয়ার বার্ষিক জিডিপি থেকে বাংলাদেশের জিডিপি অধিক। এর বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১৬টি মুসলিম দেশ থেকেও অধিক।

১৯৭০ সালে দেশের শতকরা প্রায় ৭০% ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে জীবনযাপন করছিলো, এখন তা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। আরো সুখের কথা তখন দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিলো ২৪% ভাগ, এখন তা প্রায় ৬০% ভাগে এবং দেশে জীবনের আয়ু ৩৩ বছর থেকে প্রায় ৬০ উত্তীর্ণ হয়েছে। এগুলো গর্বের কথা। আশ্বাসের কথা। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯০% ভাগ লোক বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ পাচ্ছে - এ অবস্থা অনেক ধনীক দেশ থেকেও উত্তম। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্রাজিল (৬৯%), কোরিয়া (৮৩%), পাকিস্তান (৬২%) কলম্বিয়া (৮৫%) একুয়েডর (৬৮%) এবং ইন্দোনেশিয়াকেও (৬২%) হার মানিয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসনে, শিক্ষা প্রসারে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সৃষ্টিতে এবং পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রনে দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা এন-জি-ও রা যে ভূমিকা রেখেছে তা বিশ্বে আদর্শ স্থানীয়। বাংলাদেশের 'গ্রামীণ ব্যাংক' 'ব্রাক' 'আশা' 'প্রশিখা' ইত্যাদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধূ দেশের সম্পদ নয়, দারিদ্র নিরসনে ও মহিলাদের আত্মপ্রত্যয় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠার বাহক হিসাবে আদর্শ স্থানীয় - এরা যে কর্মসুচী সফল করেছে তা জাতির জন্যে গর্বের বস্তু ।

বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে, খাদ্য উৎপাদনে,ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে, উইম্যান এমপাওয়ারমেন্টে, নারী জাগরণে, মাতৃভাষার সম্মান অর্জনে, বিশ্বে শান্তির দূত হিসেবে, এবং জাতি সংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে যে ভূমিকা রেখেছে তার জন্যে সম্মিলিত জাতিসংঘের একাধিক অংগ প্রতিষ্ঠান থেকে 'আদর্শ মডেল' হিসাবে পুরস্কার বা এওয়ার্ড পেয়েছে বার বার। জাতির জন্যে তা নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়।

বাংলাদেশের প্রতিকূল আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, প্লাবণ, দূর্যোগ, অস্বাভাকি ঘনবসতি, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা, শিক্ষার নিমন্মান, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় গোড়ামী বা ধর্মান্ধতা - এতসব সমস্যা জর্জরিত দেশও যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব সফলতা দেখাচ্ছে বা অর্জন করতে সফল হয়েছে তাতে অনেককেই অবাক করেছে।

বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যে নির্দ্দলীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি, আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান, লোকক্ষয় ও এথনিক ক্লিনজিং বন্ধের জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষর এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান বিশেষ করে 'গঙ্গার পানি চুক্তি' সম্পাদন - এ সমস্ত সরকারী সাফল্য বিশ্ববাসীর সম্মান অর্জনে সাহায্য করে। লক্ষ্যনীয় যে গেল চার বছরে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের নিবন্ধনকৃত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং সর্বমোট নিবন্ধকৃত বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ১৭ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। গেল

৩০ বছরে বাংলাদেশ ৩৪ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহন করেছে এবং গেল বছরে ১৭ বিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ বছরে যা অর্জন করেছে তার অর্ধেক গেল বছরে 'নিবন্ধকৃত' হয়েছে - তা প্রমান করে যে,স্বদেশে অনেকেই বিনিয়োগ করতে আগ্রতী।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান গেরী একারম্যান এবং স্টীভেন ক্রাউলী যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে 'বাংলাদেশ ফোকাস্' নামে দ্বিপক্ষীয় কমিটি তৈরী করেছেন এবং ছয়জন কংগ্রেসম্যান এর সদস্য। তারা বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় দেখে এ ফোকাসটি তৈরী করেছেন। তারা বলেছেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি 'মডারেট' দেশ এবং এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম গনতান্ত্রিক মুসলিম দেশ। তারা বলেছেন যে, ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার মাত্র ২৫ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে এবং বর্তমানে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৫ মিলিয়নে - এর অর্থ হচ্ছে ঐ দেশের প্রতি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস বেড়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন উভয় দেশের সম্পর্ক গভীরতর করার জন্য, এই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সফর করেন। এটা বর্তমান সরকার ও এন, জি, ও দের কৃতিত্ব। বর্তমান হাসিনা সরকার বন্ধুসুলভ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহন করায় এবং বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে উদাত্ত আহবান করায় বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, ভারত, দক্ষিন কোরিয়া ও জার্মানী যথাক্রমে ২১৮৩ মিলিয়ন, ১২৯৩ মিলিয়ন, ১১৩১মিলিয়ন, ৮৯০মিলিয়ন, ৮০০ মিলিয়ন, ৫২০ মিলিয়ন, ৩৫০মিলিয়ন, ২৭৮মিলিয়ন, ও ২২১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। যে কোন দেশের জন্যে এ অবস্থা গর্বের বিষয়। তবে দুঃখের বিষয় এইযে, এই বিরাট অংকের শতকরা ৩% ভাগও সত্যিকারভাবে বিনিয়োগ হয়নি প্রধানতঃ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দূর্ণীতি, মাস্তানবাজী, এবং হরতাল-ধর্মঘটের জন্যে। বাংলাদেশে 'নিবন্ধনকৃত' বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ১৬১৭৬ মিলিয়ন ডলার। প্রতি মিলিয়নে গড়ে বাংলাদেশে উন্নতমানের ২০৬ টি চকুরী সৃষ্টি হয় এবং এই হিসাবে এই 'নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগ' সত্যিকার ভাবে বিনিয়োগ হলে স্বদেশে অতিরিক্ত ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হতো।

দেশে আজ বেকার সমস্যা এবং এরফলে গেল দশবছরে দেশের প্রায় ২২ লক্ষ যুবক প্রবাসে পাড়ি দিয়েছেন জীবিকার অন্বেষনে। যদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দূর্নীতি কমানো যেতো তাহলে ৩৩লক্ষ না হোক, ২৫ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি সম্ভব ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, এ ব্যাপারে সরকার এখনো যথেষ্ট সজাগ নন এবং এরফলে ম্যানুফেকচারিং প্রবৃদ্ধি বা শিল্পায়ন কম হচ্ছে। ১৯৯১-৯৬ সালে যেখানে ম্যানুফেকচারিং বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৪% ভাগ তা বর্তমান সরকারে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬% ভাগে। (বাংলাদেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০০। অর্থ মন্ত্রনালয়) বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এজন্যে দায়ী করেছেন অর্থমন্ত্রনালয়ের নীতিমালাসহ দূর্ণীতি, মস্তানবাজী, হরতাল-ধর্মঘট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ও আইন শৃংখলার অবনতিকে। এসব বিষয়ে সরকারকে মনোযোগী হতে হবে। নতুবা শিল্পায়ন সম্ভব নয় এবং চাকরি সৃষ্টিও সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র ৭% ভাগ লোক শিল্পক্ষেত্রে কাজ করে এবং ৬৩% ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত।

কৃষিকাজ ও তৈরী পোষাক শিল্প সরকারী আমলার সরাসরি নিয়ন্ত্রন না থাকায় উক্ত ক্ষেত্রসমূহে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের গারমেন্টস্ শিল্পের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মোরিসাস, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, মিশর, তিউনিশিয়া, মেক্সিকো স্পেন, জামাইকা, প্রভৃতি দেশকে হার মানিয়েছে।

মোটকথা, বাঙালিরা সুযোগ পেলে কাজে সাফল্য অর্জনে বদ্ধ পরিকর। এতসব হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট সত্ত্বেও অধিকাংশ গারমেন্ট ব্যবসায়ী তাদের 'অর্ডার' যথাসময়ে সরবরাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং সেই সাথে দেশের গর্ব বর্ধিত করেছেন।

কৃষিক্ষেত্রে খালেদা জিয়া সরকারের মতো সার কেলেংকারী না করায় এবং আল্লার অশেষ কৃপায় বন্যা-অতিবৃষ্টি-প্লাবন-খরা কম হওয়ায় বর্তমান সরকার ১৯৯১-৯৬ সালের সরকার থেকে গড়ে ২০ গুণ বেশী খাদ্যশষ্য উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংস্বপূর্ণতা অর্জন করেছেন। ১৯৯১-৯৬ সালে কৃষিক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.১৮% ভাগ। হাসিনা সরকারে তা বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ৩.৪৮% ভাগে। এই বিরাট সাফল্যের পেছনে গঙ্গার পানিচুক্তি ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মোট কথা হচ্ছে যেখানে আমলাতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা কম যেমন গারমেন্টস্ শিল্প, কৃষিক্ষেত্র ও এন-জি-ও কর্মকান্ড- সেই সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন অত্যন্ত গৌরবের। সুতারাং রাজনীতিবিদদের কাছে প্রশ্ন- আমলাতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা কি কমাবেন?

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন বোধ করি। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসিত হয় সামরিক ও আধা সামরিক সরকারসমূহ দ্বারা। আর ১৯৯১-থেকে ১৯৯৬ সাল খালেদা জিয়া দেশ শাসন করেন। এই ২১ বছরের সরকারসমূহ 'ভারত গঙ্গার পানি নিয়ে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশ মরুতে পরিনত হচ্ছে' 'ফারাক্কা আন্দোলন, জাতি সংঘে বিষয়টি একতরফাভাবে বার বার উত্থাপন করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছেন যথেষ্ট, কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। বরং ভারত বিরোধী মন-মানসিকতা সৃষ্টিতে তা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দীর্ঘ ২১ বছর যে সমস্যার সমাধান আমলানির্ভর সরকারসমূহ সমাধান করতে পারেননি তা হাসিনা সরকার স্বল্পদিনের মধ্যে অভাবনীয়ভাবে সমাধা করে বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছেন অজস্র। একথা অতিরঞ্জিত হবেনা যে,ভারতের সাথে 'পানিচুক্তি' সম্পাদনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদনে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সমকক্ষতা অন্য কেউ করতে পারেন নি। তাছাড়া বয়স্কভাতা, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাতা, আশ্রায়ন, গৃহায়ন - ইত্যাদি প্রকল্প বর্তমান সরকারের সাধারণ গরিব জনগনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করে। এসব ব্যাপারেও তারা অগ্রনী এবং প্রশংসার দাবীদার।

বর্তমান হাসিনা সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন তার কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে। তবে দুটো ক্ষেত্রে আরো অধিকতর তৎপরতা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রগুলো অংগাঙ্গীভাবে জড়িত। এসব ক্ষেত্র হচ্ছে প্রথমতঃ সন্ত্রাস ও দূর্ণীতি দূরিকরণ এবং দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের উন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রে জোর প্রধান।

বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে 'মানুষ ও পানি'। এই মানুষ ও পানি কিভাবে দেশ উন্নয়নের কাজে লাগানো যায় সে ধরনের সরকার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। একথা স্বীকার্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নের উপযোগী নয়। কারণ বাংলাদেশের পাশা পাশি রাষ্ট্রসমূহ যেমন- থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন - ইত্যাদি দেশের বার্ষিক জনপ্রতি আয় বাংলাদেশ থেকে কয়েক গুণ বেড়েছে - এবং এরফলে তুলনামূলক ভাবে বাংলাদেশীর ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। অত্র অঞ্চলের গেল ৩০ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামো দেশ উন্নয়নের উপযোগী নয়।

দেশের দূর্ণীতি, সন্ত্রাস, বিচার না পাবার আশংকা, শিল্পে অনগ্রসরতা এবং আইন শৃংখলার অবনতি -এ সবের মূলে রয়েছে ত্রুটিযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো। বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে 'জবাবদিহিতার' ব্যবস্থা

নেই, পারদর্শিতা ও সততার পুরস্কার নেই, নেই দূর্ণীতি বা অপকর্মের শাস্তি এবং এরফলে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো জনগনের বন্ধু নয়, সেবক নয়, বরং অত্যাচারী স্বার্থলিপ্সু শাসক। রাজনৈতিক সরকার সমূহ যদি এই কাঠামোর পরিবর্তন না করেন তাহলে তারা তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবেন এবং জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে যে, কোনো একক কোম্পানী বা সংস্থার উন্নয়নের জন্যে উন্নত 'প্রযুক্তি বিদ্যা' যেমন উন্নয়নের প্রধান সোপান, একইভাবে জাতির উন্নয়নের জন্যেও উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা সমভাবে অত্যাবশ্যকীয়। উন্নত প্রযুক্তি ছাড়া দেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির পরিপন্থী। সুতরাং একে ঢেলে সাজাতে হবে।

'প্রযুক্তি বিদ্যা' বলতে শুধূমাত্র মেসিন, কম্পিউটার বা অটোমেশনকে বুঝায় না - প্রযুক্তি বিদ্যা রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতি, নিয়োগ-বদলি, প্রমোশন-বরখাস্ত, বিভিন্ন কর্মচারীর দায়-দায়িত্ব, নিয়োগের নিয়মাবলী, কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি অর্থ্যাৎ জ্ঞানপ্রসূত রীতি-নীতি কর্মপদ্ধতি সবকিছুই 'প্রযুক্তি বিদ্যার' অংগ বিশেষ। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্যে এর সন্ত্রাস, দূর্ণীতি ও হরতাল কমানোর জন্যে এর
বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্যে অথবা দেশের সার্বিক কল্যানের জন্যে প্রয়োজন প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। কি ধরনের পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয় তা ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। মোটকথা, আমার প্রস্তাবিত 'নির্বাচিত সরকার' ব্যবস্থার মাধ্যমেই* বঙ্গবন্ধুর স্বপন 'সোনার বাংলা' অর্জন সম্ভব। যত তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকার এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন ততই দেশের মঙ্গল।

প্রবাসীদের প্রত্যাশা
আলোকিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবাসী দেশপ্রেমিক। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এদের আগ্রহ, এদের উদ্যোগ ও আবেগ যথার্থই দলীয় সঙ্কীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। দেশের বিশেষ বিশেষ সঙ্কটে যেমন একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলন ও যুদ্ধ, আশির দশকে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠায় বা দেশের বিভিন্ন দুর্যোগে প্রবাসীরা এগিয়ে এসেছেন নিঃস্বার্থভাবে। আজকে দেশে এক মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং এ সঙ্কট উত্তরণে প্রবাসীদের দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বোধ করি। আজকে দেশে যে ক'টি প্রধান সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১. অপশাসন, ২. দুর্ণীতি, ৩. সন্ত্রাস, ৪. সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ার আশঙ্কা এবং ৫. যথার্থ বিচার না পাবার ভয়।
প্রবাসীরা দেশের সঙ্কীর্ণ গন্ডির বাইরে থেকে দেশের সমস্যাগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগ পান এবং এর ফলে এঁরা যুগে যুগে দেশে দেশে বিবর্তনকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

আজকের যুগে একটি বিষয় ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছে সকল দেশের প্রবাসীরা স্ব স্ব দেশের উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বন করেন। চীনে অভাবনীয় বৈদেশিক বিনিয়োগ অর্জনে, ভারতে টেকনোলোজি ব্যবসার সাফল্যে, সাউথ কোরিয়া বা তাইওয়ানের সার্বিক উন্নয়নে স্ব স্ব দেশের প্রবাসীদের অবদান অনুকরণীয়। বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবস্থানও উলেখযোগ্য। ১৯৯৬ সালের পর থেকে স্বদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরুপ ২০০৩-০৪ সালে সর্বমোট বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের পরিমান হচ্ছে ১.০৩৩ বিলিয়ন ডলার। এবং প্রবাসীদের 'রেমিটেন্স' হচ্ছে তার ৩ গুণ অর্থাৎ ৩.৩৭২বিলিয়ন ডলার।

এখানে উলেখ্য যে, ২০০৩-০৪ সালে সর্বমোট বৈদেশিক অনুদান ছিল ৩৩৮ মিলিয়ন ডলার এবং রেমিটেন্স হচ্ছে তার প্রায় দশ গুণ, অর্থ্যাৎ ৩৩৭২ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উলেখ্য যে, প্রবাসীরা হচ্ছে ঘরের বৌয়ের মতো-তাদের এই অভূতপূর্ব দান রাজনৈতিক মহলে বা স্বদেশের আমলাপাড়ায় কোন পাত্তা পায় না - বরং তাদের দেশের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে বঞ্চনা, নির্যাতন বা হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। দশ ভাগের এক ভাগ অনুদান পাবার জন্য দেশের সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে দুতাবাসের কর্মচারী ও আমলাকুল সার্বক্ষণিক ব্যতিব্যস্ত, কত আদর-আপ্যায়ন আর যাঁরা হাড়খাটুনি খেটে স্বদেশের জন্য সবচেয়ে বেশি 'নিট বৈদেশিক অর্থ' নিয়ে আসছেন, তাঁদের প্রতি পদে পদে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, ঘরের বৌয়ের প্রতি 'এ্যাসিড নিক্ষেপের শামিল'।

২০০৩-০৪ সালে দেশে সর্বমোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় ১২,০০৮ মিলিয়ন ডলার এবং এর ৬৩ ভাগ আসে রফতানি থেকে, ২৮ ভাগ প্রবাসীদের রেমিটেন্স থেকে এবং ৮.৬ভাগ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে। রফতানি মুল্যের ৭৪.৮ ভাগ আসে রেডিমেড পোশাক ও নিট ওয়্যার থেকে। নিট ওয়্যার ও পোশাকের সর্বমোট রফতানি হচ্ছে ৫,৬৮৬ মিলিয়ন। নিটওয়্যারে পোশাক রফতানির প্রায় ৭০ ভাগ নাকি কাঁচামাল বাবদ খরচ হয় এবং এ তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে সর্বমোট নিট আয় হচ্ছে ১,৭০৫ মিলিয়ন ডলার, যার পরিমান হচ্ছে হোম রেমিটেন্সের প্রায় অর্ধেক।

২০০২-০৩ সালে দেশে সর্বমোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় ১১,১৯৬ মিলিয়ন ডলার এবং এর ৬,৫৪৮ মিলিয়ন আসে রফতানি থেকে, ৩০৬২ মিলিয়ন আসে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ থেকে এবং ঋণ ও অনুদানের পরিমান হচ্ছে ১,৫৮৫ মিলিয়ন ডলার। অর্থ্যাৎ সর্বমোট আয়ের ৫৮.৫ ভাগ রফতানি থেকে, ২৭.৪ ভাগ

বৈদেশিক হোম রেমিটেন্স এবং ১৪.১ ভাগ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে, তৈরি পোশাক ও নিট ওয়্যার থেকে সর্বমোট রফতানি আয় হচ্ছে ৪,৯১২ মিলিয়ন ডলার। যদি ৭০ ভাগ আয় র-ম্যাটেরিয়ালের জন্য খরচ হয় তাহলে নিটওয়্যার ও তৈরি পোশাক বাবদ সর্বমোট নিট আয় হচ্ছে ১,৪৭৩ মিলিয়ন ডলার যা প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অর্ধেক। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, প্রবাসীরা যথার্থভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে সমূহ অবদান রাখছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের আজও ভোটাধিকার হয়নি।

প্রবাসীরা যে শুধু ইদানীং স্বদেশের সেবা করে যাচ্ছেন, তা নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনেও প্রবাসীরা অর্থ সাহায্য ছাড়াও জনমত গঠনে সমূহ অবদান রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বমোট ২৬৪.৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান পাওয়ান যায়, যার ৩৩.৭ ভাগ অর্থাৎ ৮৯ মিলিয়ন আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং বিদেশ থেকে ব্যক্তিগত সাহায্য আসে ২৫.৫ মিলিয়ন ডলার বা ২কোটি ৫৫ লাখ ডলার। বস্টনের প্রবাসীদের উদ্যোগে নর্থ আমেরিকা থেকে মুক্তিযুদ্ধে ৮১ হাজার ডলারের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পাঠানো হয় যার বর্তমান মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এই ৮১ হাজার ডলারের ৬৫ হাজার আসে তৎকালীন এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রবাট রাইনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বাকি ১৪ হাজার ডলার নর্থ আমেরিকার সকল প্রবাসী বাঙালি দান করেন। এই ১৪ হাজার ডলারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংক আসে বস্টনের ডা. রেজাউর রহমানের তরফ থেকে-তিনি সর্বমোট ৫০০০ ডলার দান করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিঃসন্দেহে একটি জনযুদ্ধ। কোন সামরিক প্রধান বা সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা এ যুদ্ধ জয়লাভ হয়নি। এ যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার ছিল বিশ্বজনমত এবং বাঙলার সাড়ে সাত কোটি জনতা। নগণ্যসংখ্যক বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতা হচ্ছে 'মুক্তিযোদ্ধা'। এ যুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষার দাবিতে এবং এর সমাপ্তি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। সমাপ্তির শেষলগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলার বিজয় ঘোষিত হয়। তবে আজও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা', কাজী নজরুল বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের 'নির্যাতন-বঞ্চনা বিবর্জিত স্বাধীন বাংলা বা আমাদের ঈপ্সিত আলোকিত বাংলা' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এ লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের মতো প্রবাসীদেরও দুটো বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এক. দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সকল রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু বিচার। হত্যাকারীদের বিভিন্ন অজুহাতে প্রোটেকশন দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রত্যেক হত্যাকারী ও তাদের মদদদাতাদের যথার্থ শনাক্তকরণ ও ন্যায্য বিচার পাওয়ার আন্দোলনে আপনাদের সক্রিয় উদ্যোগ কামনা করি। দ্বিতীয়ত, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কাঠামো দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক না হলেও যুগোপযোগী নয়। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। এর স্থলে বৈজ্ঞানিক টেকনোলজিসম্মত যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন। এমন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমেই বর্তমান সঙ্কটসমূহের যেমন নিস্পত্তি সম্ভব, একই সময়ে স্বদেশে প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়নের সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যার ফলে স্বদেশের ত্বরিত উন্নয়ন ও আলোকিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

লেখক প্রবাসী শিক্ষাবিদ ও গবেষক]

একুশে ফেব্রুয়ারী ও নতুন শপথের ডাক

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জনগনের মাতৃভাষা জ্ঞবাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন এবং একে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাঞ্চ। সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং এ জন্যে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে নগ্ন-পায়ে কালো ব্যাজ পরে শহর প্রদক্ষিণ করার পরিবর্তে কিভাবে বাংলাকে এবং বাংলা ভাষাভাষীকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্টত্বের আসনে সমাসীন করা যায় সে নিয়ে আলাপ-আলোচনা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অনুরূপ উৎসবের আয়োজন করা সমীচিন বলে মনে হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলার গৌরবের দিন। নিজেদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জ্ঞবরকত সালামের খুনে ঐদিন ঢাকার রাজপথ হয়েছিল রক্তরাঙাঞ্চ।জনগন পুলিশের গুলী আর টিয়ারগ্যাসকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজেদের জন্মগত অধিকার আদায়ের রক্ত শপথ গ্রহণ করে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনের দিনে যে জিনিষটি সবচেয়ে মুখ্য তা হচ্ছে, একুশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের দিক নিদর্শণ করা।

একুশের আন্দোলন ব্যাপক অর্থে স্বাধীকারের আন্দোলন- নিজেদের প্রাপ্য দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই যদি হয় তাহলে আজকের বাংলাদেশে যেখানে দেশের জনগোষ্ঠি গুটিকতেক আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে জিম্মি জীবন-যাপন করছেন, সেখানে জনতার আশা-আকাঙ্খা, জীবনের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত, যেখানে জনতার নামে অর্জিত বৈদেশিক সম্পদ গুটিকতেক সুখ আহ্লাদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, ঘরের মালিক ও দাস-দাসীর মধ্যে ক্রীতদাসের মতো জীবন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে দেশের সম্পদ ধনিক শ্রেণী ব্যবসার নামে পুকুরচুরি করে বৃহত্তর জনগনকে দেউলিয়া করে রাখছে, এমন সমাজ জীবনে আজকের একুশের প্রেরণা হবে এমন জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে নতুন শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে স্থানীয় নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এমন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগন কাকে স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসার নিয়োগ করা হবে, কাকে শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হবে, কাকে করা হবে হেল্‌থ অফিসার, কোথায় নতুন স্কুল, কলেজ বা রাস্তাঘাট নির্মিত হবে এবং এসব পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য কত টাকা কর হিসাবে আদায় হবে সাংবিধানিক দায়িত্বে থাকবেন। তার ফলে কেউ যদি

স্থানীয় জনগনের উন্নয়নে বিমুখ হন বা জনগনের সেবায় মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ না হন কিংবা কেউ যদি ঘুষ-চুরি ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় জনগনের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলেন, তাহলে স্থানীয় জনগন তাকে শুধু বরখাস্ত করার অধিকার রাখবেন না, তাকে উপযুক্ত শাস্তির জন্যে কোর্টের কাছে সোপর্দ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষ স্থানীয় জনগনের উন্নয়নে বিশিষ্টতা অর্জন করেন ।

তাহলে স্থানীয় জনগন তাকে অধিকতর বেতন বা ভাতা প্রদান করবেন এবং এমতাবস্থায় অন্যান্য স্থানীয় সরকার সমূহ উপযুক্ত লোকদের নিয়োগ করার জন্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন। এমন

অবস্থায় উপযুক্ত ব্যক্তি বিশেষকে মর্যাদা দেয়া হবে, কর্ম-কুশলতাকে মর্যাদা দেয়া হবে-উপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ক্যাডার বা চাকুরির সিনিয়রিটিকে প্রাধান্য দেয়া হবে না। এতে করে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে, ঘুষ-চুরি কমবে, জনগনের জিল্লতি কমবে, জীবনের নিরাপত্তা বাড়বে এবং সর্বোপরি গোটা দেশবাসীকে গুটিকতেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং উর্ধ্বতন কর্মচারীর হাতে জিম্মি থাকতে হবে না।

নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপযুক্ত যোগ্য লোকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং একই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লক্ষ কোটি জনতাকে নিজদের স্ব স্ব এলাকা গড়ে তোলার জন্যে অংশীদার করা সম্ভব। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঢাকা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জনগন নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত নন বিধায় সারা দেশজুড়ে সরকার ও জনগনের মধ্যে বিরাট ফারাক তৈরী হয়েছে।

জনগনই সকল শক্তির আধার, সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার বাহক এবং স্রষ্টা। সুতরাং জনগনকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে হবে। উল্লেখিত নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় দেশের সকল অঞ্চলের জনগনকে দেশ গড়ার কাজে, নিজেদের এলাকা বা অবস্থার উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। আজকের একুশে ফেব্রুয়ারীর ব্রত হওয়া উচিত অনুরূপ এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে রক্ত শপথ গ্রহণ করা। তাহলেই বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্টত্বের আসনে সমাসীন হতে পারবে-বাংলা এবং বাঙালি জাতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবে বলে আমার বিশ্বাস। (বস্টন, ম্যাসাচ্যুসেটস, ১৯৯৬)

বাংলাদেশের সমস্যাঃ
সন্ত্রাস, বিচার বিভাগ, বেকারত্ব ও দূর্ণীতি

তখন মনে হয় ১৯৭৭ সাল। তেহরানের খাক্ প্রাসাদে আমরা তখন রাজকীয় অতিথি। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি চীপ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল জিয়াউর রহমান জিজ্ঞেস করলেন- 'বাংলাদেশের একচুয়েল লোক সংখ্যা কত এবং দেশের কতটি ইউনিয়ন কাউন্সিলে নির্বাচন হচ্ছে'? বিকেলে উনার সাংবাদিক সম্মেলন এই প্রাসাদেই। বল্লাম- 'স্যার লোকসংখ্যাতো দুই প্রকার, কোন্টা বলবো?' তৎকালীন অর্থ উপদেষ্টা ডঃ এম, এন হুদা বাঁধা দিয়ে বল্লেন-লোকসংখ্যা দুই প্রকার - এর অর্থ কি? বল্লাম- স্যার একটা বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য নেয়ার জন্যে মাথা গননা যার সংখ্যা হচ্ছে ৮১ মিলিয়ন এবং অন্যটি হচ্ছে যাদের জন্যে সরকারের সব আইন-কানুন, সুযোগ-সুবিধা তৈরী হয়, যাদের জন্যে সরকারের সব সম্পদ ব্যয়িত হয় এবং এদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র দশ হাজার।

এবারে দেশে গিয়ে দেখলাম এ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে- বর্তমানে তা বেড়ে গিয়ে প্রায় দশ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। গারমেন্টস্ শিল্প ও এপার্টমেন্ট ডিভালাপারদের কারণে এবং গেল কয়েক বছরে মন্ত্রনালয়ের সংখ্যা ২১ থেকে ৩৫টি এবং দপ্তরের সংখ্যা ১০৯ থেকে ২২১টিতে বর্দ্ধিত হওয়ার সাথে সাথে দেশে সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা সাড়ে ৪ লাখ থেকে বেড়ে গিয়ে প্রায় ১২ লক্ষতে পৌছেছে।

এর ফলে দেশের সম্পদ এখন অনেকের হাতে পৌছার সুযোগ হয়েছে; যার ফলে 'আসল লোক সংখ্যার'' পরিমানও কয়েকগুণ বেড়েছে। এখন এয়ারপোর্টের 'ভি-আই-পি রুমে অনেক অপরিচিত লোকের সমাগম ঘটে। এক সময় ছিল যখন ভি-আই-পি রুমের প্রত্যেকে প্রত্যেককেই চিনতেন-সেদিন পাল্টিয়েছে। এখন অন্য অবস্থা। এখানে বলে রাখা সঙ্গত যে বাংলাদেশের ভি-আই-পি মানসিকতা সম্পন্ন সমাজে পরিবারের একজন পদাধিকারবলে 'ভি-আই-পি' হলে বৃহত্তর পরিবারের বাদবাকী সবাই ভি-আই-পি এমনকি ঘরের পরিচারিকাও!

গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়ও এই আমলাতান্ত্রিক কৌলিন্যবাদী উপনিবেশিক প্রথার পরিবর্তন হয়নি- বরং নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও স্থায়ী আমলাদের মতো ভি-আই-পি মানসিকতায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। উন্নত দেশে ভি-আই-পি প্রথা না থাকায় সাধারণের প্রবেশ বা অভ্যর্থনা রুমের সুযোগ-সুবিধা উত্তরোত্তর বেড়েছে আর আমাদের দেশে রাজা-প্রজা বা শাসক-শোষিতের আমলাতন্ত্র চালু থাকায় এ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। ভি-আই-পি রুমে বিনা পয়সায় ফোন করার সুযোগ রয়েছে- সাধারণের কক্ষে পয়সা দিয়েও ফোন করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

ভি-আই-পি মানসিকতা

বাংলাদেশের ভি-আই-পি প্রবেশ / প্রস্থান পথ হচ্ছে চোরাকারবারীর বা ড্রাগ ট্রাফিকিং এর অন্যতম প্রধান সদর দরজা। ঢাকার ধনীক এলাকা সমূহের দোকানগুলোতে যে সমস্ত দামী বিদেশী দ্রব্য পাওয়া যায় তার এক বিরাট অংশ আসে এই ভি-আই-পি পথে টেরিফ ফাঁকি দিয়ে। অনেকের ধারণা যে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত অমূল্য ঐতিহাসিক ভাস্কর্য বিদেশে পাচার হয়ে গেছে তার অধিকাংশ পাচার হয়েছে এই ভি-আই-পি পথে।

ধনীক দেশ সমূহে যে সমস্ত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এর পুরো চামড়া পাওয়া যায় তার অনেকগুলো এসেছে ঢাকার ভি-আই-পি পথে। সুতরাং ভি-আই-পি রুম ভেঙ্গে দিয়ে একে সাধারণের অভ্যর্থনা কক্ষের সাথে যুক্ত করলে অনেক আমলার মাসিক আয়ের পরিমান কমে যাবে বৈকি! তবে উল্লেখ্য যে, জিয়া বিমান বন্দরের প্রবেশ পথের ইমিগ্রেশন ও ব্যাগেজ এলাকা আগের থেকে অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন চেকিং ব্যবস্থা যে কোন উন্নত দেশের মতো কুইক তবে লাগেজ ক্যারলের ও কার্টের অবস্থা তথৈবচ-একাধিক ফ্লাইট একসাথে পৌছলে যাত্রীদের অবস্থা করুণ- হয়রানির শেষ নেই। তবে সুখের কথা যে, ইদানীং লাগেজ ক্যারল এলাকায় ফরেন এক্চেঞ্জ চোরাকারবারীদের প্রকাশ্যে ডলার - রিয়াল খরিদ করতে দেখা যায় না।

অলি-গলি জায়গা দখল, যানজট

গেল কয়েকবছর থেকে দেশে পর পর ধানচাল ও সবজির বর্ধিত ফলন হওয়ায় এবং বন্যা-প্লাবন না হওয়ায় গ্রাম বাংলার সাধারণ নাগরিকের জীবনে দারিদ্র কিছুটা কমেছে। এখন আগের মতো গ্রাম বাংলার রাস্তার দু'ধারে নেংটা ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখা যায় না। বরং রিকশা ভর্তি সবজি, শার্টপেন্ট পরা ছেলেমেয়ে এবং সেন্ডেল পরা মুসল্লিদেরও দেখা যায়। বোরকা পরা মহিলাদের সংখ্যাও বেড়েছে। সেদিক থেকে দেশের উন্নয়ন হয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া ঢাকার ধনীক বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িগুলোতে আসবাবপত্র বা ফার্ণিচারের উন্নয়নও হয়েছে - অনেক দামী জিনিসের হলাহল। ঝাকঝমকে বিয়েসাদীর সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। তবে মশার উপদ্রব,সন্ত্রাসের ভয়, চাকরির অভাব,যানজটের অবস্থা, রাস্তাঘাটের জোর-দখল, দূষনীয় পরিবেশ এবং বিশেষ করে 'সত্যিকার বিচার না পাওয়ার আশংকা' জনজীবনে নিয়ে এসেছে ভয়-ভীতি অনিশ্চয়তা আর হতাশা।

আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রথমতঃ সন্ত্রাসের ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিচার না পাওয়ার আশংকা। সন্ত্রাস সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে দু'টো বিষয়ে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন বোধ করি। প্রথমতঃ হচ্ছে বেআইনীভাবে সরকারী রাস্তা দখল করে বড় বড় দালানকোঠা বা দেওয়াল তৈরী করার ফলে সারাটি শহর অলিগলিতে রূপ নিচ্ছে এবং এরফলে যদি কোথাও আগুন ধরে বা ইমার্জেন্সী অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে দমকল বাহিনী বা এমবুলেন্সের অকুস্থলে পৌছার উপায় থাকবে না। দূর্নীতি পরায়ন কর্মচারীরা অল্প টাকার বিনিময়ে মানুষের জানমালের উপর যে দুঃখজনক অবস্থা ডেকে আনছেন তা থেকে তারা কি রেহাই পাবেন? আগুন লাগলে অথবা দৈহিক বা শারিরিক ইমারজেন্সির প্রয়োজন হলে রাস্তার ঐ দুই হাত জায়গা যা তারা ঘুষের বিনিময়ে বেদখল করতে আপত্তি করেননি -তা তাদের জীবনেও অভিশাপ নিয়ে আসতে পারে।

সন্ত্রাস, বিচার বিভাগ, চাকরির অভাব

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে তাদের রাস্তায় চলাকালে সাধারণ যানবাহন স্বল্প সময়ের জন্যে স্থগিত রাখা হয়। যেহেতু রাস্তাঘাট অল্প এবং যানজট প্রচুর সেজন্যে এতে জনগনের যথেষ্ট দূর্গতি হয়। অনেক দেশে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে সে জন্যে রাষ্ট্রপতি যেখানে থাকেন সেখানেই তিনি অফিসও করেন। ওয়াসিংটনের'হোয়াইট হাউসের'দোতলায় প্রেসিডেন্ট বসবাস করেন, একতলায় দপ্তর চালান। এরফলে আনাগোনাতে তার অতি মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না এবং নিরাপত্তাও বিঘিন্ত হয় না।

আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টরাও একইভাবে একই বিল্ডিংএ বসবাস করেন ও দপ্তর চালান। এতে তাদের অতি মূল্যবান সময় যাতায়াতে নষ্ট হয় না। বাংলাদেশের সরকার প্রধান যদি একই স্থানে বসবাস ও দপ্তর পরিচালনা করেন তাহলে নিরাপত্তা বাড়বে, যানজট কমবে এবং আনাগোনায় সময় নষ্ট হবে কম। বিষয়টি সরাকার প্রধান বিবেচনা করতে পারেন বৈ কি !

দেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাসের ভয়, বিচার না পাওয়ার আশংকা, চাকরির অভাব এবং দূর্নীতি। দূর্ভাগ্য যে, দেশের রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মসূচী এ বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহন করেনি- বিরোধী দলসমূহ বেআইনীভাবে সরকারের পতন ঘটাতে ধর্মঘট - হরতাল আহবান করে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার মতলবে ব্যস্ত। আর সরকারদল বিরোধীদল সমূহকে বা তাদের নেতাদের জেল-জুলুম দিয়ে হয়রানিতে রাখতে ব্যস্ত। উভয় দলের মূখ্য উদ্দেশ্য গদিতে যাওয়া-কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে নয়, ছল-চাতুরী বা সরকারকে অকেজো করে; মানুষের জীবনকে হাইজ্যাক করে। এমন অবস্থা সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক নয়।

ঢাকার পুলিশ আই-জির তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে প্রতিমাসে মাত্র ৬১টি গুরুতর অপরাধ ঘটে। কিন্তু দেশের পত্রিকা খুললেই রাহাজানি, ধর্ষণ, হত্যা, সন্ত্রাস লেগেই আছে দেখা যায়।

আই-জির দপ্তর জানালেন যে, অনেকেই অপরাধ ঘটলেও পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে না এবং এজন্যে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। তবে তার মতে 'সন্ত্রাস নয়, সন্ত্রাসের ভয়ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ও ভয়ানক'। দেশে দুই ধরণের সন্ত্রাসী রয়েছে- প্রথমতঃ বেকার যুবক। এদের অনেকেই শক্তিশালী রাজনীতিবিদ বা সরকারী আমলার সহায়তা বা ছত্রছায়ায় থাকে। এরা বাড়ি বানাতে গেলে চাঁদা চায়, ব্যবসা করতে গেলে চাঁদা চায়, ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলে হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়, টেন্ডার দিতে দেয় না, বাড়িতে এসে হানা দেয় এবং যখন-তখন নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে খুন-খারাবি করে। এদের কোনো দল নেই -তারা সব দলের। এদের কথা পত্র-পত্রিকায় যদিও সব সময় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু এদেরকে পুলিশ ধরে না। এদেরকে কোর্টে নিলে পুলিশ রিপোর্টে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় কোর্ট তাদের ছেড়ে দেয়। এরা এক ধরণের সন্ত্রাসী এবং এদের মদদ জোগায় সরকারী আমলা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশেষ করে দূর্নীতিপরায়ন পুলিশ বাহিনী। যেহেতু এদের শাস্তির বিচার হয় না, শাস্তির বিচার নেই, সুতরাং এরা যথেচ্ছচারী হয়ে উঠে। এদের ভয়ে জনগন আতংকিত। তবে এদের থেকে বড় সন্ত্রাসী হচ্ছে দূর্নীতিপরায়ন আমলা। এই দূর্নীতিপরায়ন আমলারা আপনার জীবনকে নাভিশ্বাষ করে তুলে এবং তাদের ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে তারা সন্ত্রাসীদের আপনার পেছনে লাগিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূর্নীতি পরায়ন দেশ

আজ বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দূণীতিপরায়ন দেশ হিসেবে পরিচিত এবং বিশ্বব্যাংকের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় বার্ষিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার আরো অতিরিক্ত ২.৯% ভাগ বাড়তো যদি দূর্নীতি না থাকতো। * সম্প্রতি (২৮শে জুন-২০০১) বিশ্বের একটি নির্ভরশীল দূর্নীতি পর্যবেক্ষক সংস্থা Transparency International জানিয়েছে যে, বিশ্বের ৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে দূর্নীতি পরায়ন দেশ। তাছাড়া দারিদ্র ২৫%ভাগ কমতো এবং দেশের গড় মাথাপিছু আয় দুইগুন বাড়তো।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর জনপ্রতি কাষ্টমস অফিসাররা ঘুষের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১,২৫,০০০ থেকে ২ ংফংমহথ টাকা এবং আয়কর অফিসাররা জনপ্রতি ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় করেন। রাজস্ব বিভাগ ও চাটগাঁর পোর্ট ট্রাস প্রতিবছর অতিরিক্ত ৬ হাজার কোটি টাকা আত্মস্যাৎ করেন। প্রতিটি পাওয়ার কানেকশানের জন্যে প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা, বাসা-বাড়ির কানেকশানের জন্যে ১০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এভাবে শুধূমাত্র পাওয়ার কানেকশানের বাবদ সরকারকে প্রতিবছর একহাজার কোটি টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে।

প্রতিটি পদে পদে ঘুষ দিতে হয় বলে বাংলাদেশ labor cost কম হওয়া সত্ত্বেও শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়- transaction cost অত্যধিক বেশী হওয়ায় দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে না এবং এরফলে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী হাসিনা সরকারের বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রচারণা সফল হওয়ার ফলে স্বদেশে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারের 'বৈদেশিক বিনিয়োগ'নিবন্ধিত হয়েছে। তবে কার্যপদ্ধতি, বিনিয়োগ পরিবেশ ও দূর্নীতি প্রবল হওয়ায় এই নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের মাত্র ৮.৩% ভাগ বাস্তবে বিনিয়োগ হয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এর পরিমান বড়ই কম-অন্যান্য দেশে নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের ৭০% থেকে ১০০% ভাগ বাস্তবে বিনিয়োগ হয়। এই বিনিয়োগ না হওয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, ধর্মঘট, লালফিতার দৌরাত্ম ও আইন শৃংখলার হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থা। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধান মস্তান, চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসীরা হচ্ছে দূর্নীতিপরায়ন আমলাগোষ্ঠী যাদের কারণে দেশের শিল্পায়ন বিঘিন্ত হচ্ছে এবং বেকার সমস্যা বাড়ছে, সন্ত্রাস বাড়ছে।

গেল বছর জেদ্দার রাজকীয় অতিথি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি দূর্নীতি দমনের প্রতি আহবান করলে বন্ধুবর তৎকালীন চীফ প্রোটোকল অফিসার রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে ইতালীর রাষ্ট্রদূত) ও তৎকালীন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোমেন চৌধূরী বাঁধা প্রধান করে জানালেন যে, কেনিয়া ও নাইজেরিয়ায় অধিকতর দুর্নীতি রয়েছে এবং এরফলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া সহজ, তবে এটা দেশের কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সন্ত্রাসের ভয় দিন দিন বাড়ছে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বিশ্বব্যাংকের বহুজাতিক অনুদান ও ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন বিঘন্ সৃষ্টি হবে তেমনি স্বদেশের উন্নয়নও বিঘিন্ত হবে।

এই দুর্নীতি পরায়ন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির অন্যতম পথ হচ্ছে জেলায় জেলায় নির্বাচিত জেলা সরকার ব্যবস্থার সৃষ্টি যারা সম্পদের বিলিবন্টন, কর্মচারীর নিয়োগ ও বরখাস্ত, বেতন ও অন্যবিধ ভাতা, স্থানীয় আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সবকিছুর দায়িত্বে থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিতকরণ ও ডেপুটি সেক্রেটারীর উর্ধ্বের সকল সরকারী পদবী পাবলিক শোনানীর মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য লোকের নিয়োগ প্রদান। অর্থাৎ প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক কাঠামো সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজন। না হলে দেশের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিচার না পাওয়ার আশংকা এবং যথেচ্ছাচারিতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

রিয়াদ,
জানুয়ারী ২০০১

বাংলা নব বর্ষ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশে এক ধরণের গোঁড়া ধর্মাবলম্বী মুসলমান রয়েছেন, যারা ১লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালনকে অধর্ম এবং ইসলামের পরিপন্থী মনে করেন। বৈশাখ শব্দের সাথে তারা হিন্দুয়ানী গন্ধ পেয়ে থাকেন এবং *বঙ্গাব্দ* বা বাংলা ক্যালেন্ডার তারা কোনো ক্রমেই গ্রহণ করতে রাজি নন। এদের ধারণা বিশ্বকর্তা মুসলমানদের হিজরী মাস যেমন মোহররম, রমজান, রবিউল আউয়াল, রবিউস্‌সানি ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। বিশ্বকর্তার বিশালতা ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই স্থূলজ্ঞান থাকায় এ ধরণের উচ্ছ্বাস ও আবেগ অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিশ্বকর্তা যেমন বিভিন্ন ধরণের ও জাতের মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন একিভাবে বিভিন্ন রকমের ভাষা ও ক্যালেন্ডার মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর রঙের ও বৈচিত্রের খেলা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে তিনি সব ভাষার মালিক, সব ক্যালেন্ডারের স্রষ্টা-সবকিছুই তিনি জানেন ও বুঝেন। সবই তার। সুতরাং বৈশাখ হিন্দুয়ানী আর হিজরী মুসলমানী- এ ধরণের বিতর্ক নিরর্থক। এ গুলোর দাবীদার হয়ে ঝগড়া-বিবাদ ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ অবান্তর। মহান আল্লাহপাক চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তৈরী করে দিয়েছেন সময় তারিখ গণনার জন্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করার জ্ঞানবুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। তা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্ঠান-জৈন ও মুসলমানদের বিভিন্ন পূজা-পার্বন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির সন-তারিখ নির্ণয়ের জন্যে প্রায় ৩০টি বিভিন্ন ধরণের ক্যালেন্ডার রয়েছে। এ গুলোর অনেকগুলোই চন্দ্রভিত্তিক। আবার অনেকগুলো সূর্য ভিত্তিক।

আরবী মাস চন্দ্র ভিত্তিক, তবে ইংরাজি মাস সূর্য ভিত্তিক এবং এ জন্যে এদের মধ্যে বছরে প্রায় ১১ দিনের তফাৎ লক্ষিত হয়। চন্দ্র-বছর (lunar year) ৩৫৪ দিন, ৮ ঘন্টা, ৫৩ সেকেন্ডে হয়। তবে সূর্য-বছর (solar year) হতে ৩৬৫দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৬ সেকেন্ডের দরকার হয়।
সম্রাট আকবর সহজে খাজনা আদায়ের জন্যে বাংলা ক্যালেন্ডার বা তারিখ-ই-ইলাহী (আল্লাহর ক্যালেন্ডার) চালু করেন ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে বা (৯৯২ হিজরি)তে। দ্বীন-ই-ইলাহীর মতো এও ছিলো এক সকল ধর্মের সম্মিলন। ঐ সময়ে সম্রাটের খাজনা আদায় হতো শস্য প্রদানের মাধ্যমে। শস্য ফলনের পর পরই খাজনা আদায় হলে সাধারণ কৃষককূল সরকারের উপরে অসন্তোষ হবে না এ জন্যে যে, তখন অভাবের টান নেই এবং তাতে প্রথমতঃ সহজে খাজনা আদায় হবে এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও কম হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার মানুষ সব সময়ই খুব স্বাধীনচেতা হওয়ায় সময় সময় তারা দিল্লীর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতো- এ অবস্থা এড়ানোর জন্যে সম্রাট আকবর তার দরবারের বিশিষ্ট জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ আমির ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন এমন একটি সন-তারিখ নির্ণয় করে দেন যাতে নবান্ন আদায় সম্ভব হয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্য বহাল থাকে। তার উপদেশে সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে বাংলা নববর্ষ চালু করেন। তবে আরবি হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে ৯৬২ বঙ্গাব্দকে বা ৬২২ খৃষ্টাব্দকে প্রথম বর্ষ হিসেবে ধরা হয়। হিজরি ক্যালেন্ডার চালু হয় দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) সময় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই বা ১২ই রবিউল আওয়ালে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং তার ১৬ বছর পর ১২ই রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে হিজরি সন শুরু হয় ১লা মোহররমে এবং ৬৩৮ সনের

পরিবর্তে ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে। তাছাড়া বাংলা সন ও তারিখ শব্দ সমূহ আসে আরবি *সানা* (বছর) ও *তারিখ* (দিন বা দিক) থেকে। যেহেতু বাংলা নববর্ষ ফসল আদায়ের জন্যে ব্যবহৃত হতো, সে জন্যে একে ফসলী সন ও বলা হয়ে থাকে।
এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা সন ও আরবি হিজরি সন এ দুটোই মহানবীর হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে তৈরী হয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বর্তমানে হিজরি সন হচ্ছে ১৪২৩ আর বাংলা সন হচ্ছে ১৪০৯- এ কেমন করে !?

আগেই বলেছি বাংলা সন মূলতঃ সূর্য ভিত্তিক এবং আরবি সন হচ্ছে চন্দ্র ভিত্তিক। যেহেতু বছরে ১১ দিনের ব্যবধান হয় চন্দ্র ও সূর্য ভিত্তিক হিসাব-নিকাসে। সেজন্যে বাংলা সন ও হিজরি ক্যালেন্ডারের মধ্যে গেল এত বছরে সর্বমোট ব্যবধান হয়েছে ১৪ বছরের। যদিও উভয়ের গণনা শুরুর দিন ধার্য করা হয় একই বছরকে কেন্দ্র করে।

সম্রাট আকবর ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে অনুরূপভাবে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক ভৌগলিক এলাকার জনগন সেই সব সন তারিখ বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় কিংবা গ্রেগোরিয়ান (ইংরেজি) সন তারিখ গ্রহণ করেন। তবে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়াদিতে এখনো জনগন চন্দ্র ভিত্তিক সন তারিখ ব্যবহার করেন এবং প্রশাসনিক কাজে তার গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার সূর্য ভিত্তিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছেন।

যেহেতু সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা, দাবী-দাওয়া ইত্যাদির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ সিরাজী ভারতীয় তিথি (চন্দ্র দিন) রাশী (জডাইয়িক অবস্থান) ইত্যাদি বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন এবং হাজার বছরের পুরানো ভারতীয় শাকা ক্যালেন্ডারের সাথে পরিচিত ছিলেন, সেজন্যে মাসগুলো স্থানীয় মাসগুলোর হিসাবে গ্রহন করেন। ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডারে সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান ও দিনক্ষণ নিম্নরূপ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে নববর্ষ হচ্ছে ১৪ই এপ্রিল, শ্রীলংকায় ১৩ই এপ্রিল এবং নেপালে ১২ই এপ্রিল- এমন সাদৃশ্য প্রমান করে যে, যদিও আরবি হিজরির প্রেক্ষিতে বাংলা নববর্ষ শুরুর তারিখ নির্ণয় হয়, তবে মাস দিনের সময় নির্ণয় হয় ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক।

ভারতীয় ধর্মীয় ক্যালেন্ডার ও সূর্যের অবস্থান

বাংলা তারিখ	সূর্যের অবস্থান	দিনের সময়	গ্রেগোরিয়ান তাঃ
১লা বৈশাখ	২৩.১৫ ডিগ্রি	৩০.৯	এপ্রিল ১৩
১জ্যৈষ্ঠ	৫৩.১৫''	৩১.১	
১আষাঢ়	৮৩.১৫''	৩১.৫	জুন ১৪
১ শ্রাবণ	১১৩.১৫''	৩১.৪	জুলাই ১৬
১ভাদ্র	১৪৩.১৫''	৩১.০	আগষ্ট ১৬
১আশ্বিন	১৭৩.১৫''	৩০.৫	সেপ্টেম্বর ১৬
১কার্ত্তিক	২০৩.১৫''	৩০.০	অক্টোবর ১৭
১অগ্রহায়ণ	২৩৩.১৫''	২৯.৬	নভেম্বর ১৬
১পৌষ	২৬৩.১৫''	২৯.৪	ডসেম্বর ১৫

১মাঘ	২৯৩.১৫''	২৯.৫	জানুয়ারী ১৪
১ফাল্গুন	৩২৩.১৫''	২৯.৯	ফেব্রুয়ারী ১২
১চৈত্র	৩৫৩.১৫''	৩০.৩	মার্চ ১৪

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ক্যালেন্ডার প্রথম পাঁচটি মাস- বৈশাখ থেকে ভাদ্র-৩১ দিনে হয় এবং বাকী সাতটি মাস ট্ট আশ্বিন থেকে চৈত্র- ৩০ দিনে। তবে প্রতি চার বছর অন্তর যখন বছর ৩৬৬ দিনে হয় (সৌর জগতের কারনে) তখন ৩০ দিনের ফাল্গুন মাস ৩১ দিনে রূপ নেয়। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি ৪ বছর অন্তর ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে ১ দিন অতিরিক্ত যোগ হয়- ফাল্গুন মাস ফেব্রুয়ারিতে অবস্থিত হওয়ায় ফাল্গুনে ১ দিন যোগ দেয়া হয়।

বাংলা বঙ্গাব্দ ১৫৫৬ খৃঃ বা ৯৬৩ হিজরি থেকে গননা করা হয়। কারণ ঐ সালে সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন। পাক-ভারতে রাজা -বাদশার সিংহাসন আরোহন ভিত্তিক ক্যালেন্ডার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন-লক্ষ্মনাব্দ, বিক্রমাব্দ, (জালালী সন, সিকান্দর শাহ সন) শকাব্দ, গুপ্তাব্দ ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, সম্রাট আকবর আকবরাব্দ না বলে বঙ্গাব্দ চালু করেন। বঙ্গাব্দ শব্দটি সারা বঙ্গের প্রতীক বলে আকবর প্রবর্তিত বাংলা ক্যালেন্ডার বিলীন হয়ে যায়নি।

বরং বাংলার জনগন একে নিজেদের ক্যালেন্ডার হিসাবে গ্রহণ করে একে আপন মহিমায় সাজিয়ে রেখেছে- প্রতি বছরে নববর্ষ নতুন আশা ও প্রেরণা নিয়ে বাংলার দ্বারে উপস্থিত হলে জনগন তাকে আপন ভূবনে সাদরে গ্রহণ করে। কবির ভাষায় - *এসো হে বৈশাখ, এসো....এসো.....*

হোয়াইটীকার এলমানাক্ বর্ণিত- (Whitaker Almanac) ভারতবর্ষের ৭টি প্রধান প্রধান ক্যালেন্ডার.....

ইংরেজি ২০০০ সালে ওগুলোতে বর্ষ পর্ব কত তা লিপিবদ্ধ হলো

*কালি ইউগা ক্যালেন্ডার-	৬০০১ সাল
*বৌদ্ধ নিরবানা ,,	২৫৪৪ ,,
*বিক্রম সমভাত ,,	২০৫৭ ,,
*সাকা ,,	১৯২২ ,,
*ভিদান্ত জয়তীশা ,,	১৯২১ ,,
*বাংলা নববর্ষ বা তারিখ-ই-ইলাহি	১৪০৭ ,,
*কল্লাম ,,	১১৭৬ ,,

৮ই বৈশাখ ১৪০৯ বাঙলা
২১ এপ্রিল-২০০২ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর তব হে....
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে...।

আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪১তম জন্মজয়ন্তীতে উপরের গানটি বার বার উথলি উঠছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে 'অন্তর বিকশিত করার, নির্মল করার এবং সুন্দর করার' ডাক এসেছে। আজ সারা দেশে হিংসা, প্রতিহিংসা ও সন্ত্রাসের এক মন-মানসিকতা যেভাবে সর্বস্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সে থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে হৃদয়ের পরিস্ফুটন। তাহলেই এ পংকিল পথ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আজকের বাংলা দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগীতা ও সম্মানবোধ নেই বললেই চলে। প্রাক্তন মন্ত্রী বা জননেতাদের লাঠিপেটা করে নির্যাতন এবং জেলের অভ্যন্তরে বিনা বিচারে আটকাবস্থায় অমানবিক আচরণ করে দম্ভ প্রকাশ নিকৃষ্ট মনেরই পরিচায়ক বৈকি! এ ধরনের অত্যাচার বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ১১নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থীই শুধু নয়, এটা জাতির জন্যে কলংককর, লজ্জাজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতি পিছিয়ে যেতে বাধ্য। যারা এখন শক্তিধর তাদের জানা আছে...

'হে মোর দূর্ভাগা দেশ
যাদের করেছো অপমান
অপমান নিতে হবে তাদের সবার সমান'
অথবা-
"যারে তুমি নীচে দেখ
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছো যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"

আজ বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন দেশ অজয়কে জয় করার পথে। সেই একি সময়ে রবিঠাকুরের ভাষায় আমরা এখনো "উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুমড়ার মোকদ্দমা নিয়েই ব্যস্ত।" এ অবস্থা থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে।

এজন্যে সকল দলের, সকল মতের আজ প্রয়োজন 'দ্বার রুদ্ধ করিওনা, প্রবেশের দ্বার দিয়া প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিবে- যেখানে দ্বার রুদ্ধ সেখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে'। সুতরাং

'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্তি তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত্ত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।

বাংলাদেশে গেল নির্বাচনোত্তর সংখ্যা লঘুদের উপর অমানবিক নির্যাতন এবং গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতের গুজরাটে মুসলমানদের উপর নিধনযজ্ঞ প্রমান করে যে, মানুষের মাঝে অশুভ শক্তি এখনো প্রবল। সকল মানুষ এক আদমের সন্তান একথা কীভাবে আমরা বার বার বিস্মৃত হই? এই ভারতবর্ষে -

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন-
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন"

তারপরও কীভাবে আজো আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানবহত্যায় মহাব্যস্ত? বরং আমাদের আহবান হওয়া উচিত...

"এসো হে আর্য, এসো হে অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজি তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মন, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার"।

গেল কয়েকমাসে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে শিশু-কিশোর, বালিকা-গৃহবধু-বৃদ্ধা- এরা যেভাবে লাঞ্চিত হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে তা দেখে নীরবে নিভৃতে কাঁদতে হয়।

"শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেব-দেবী প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাঁটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়, রবি উঠে, নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশিথ হবে নাকি ক্ষয়।

চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাঁটিবে হৃদয়?
মরমে লুকাবো কত মুখ, ঢাকিয়া রাখিছি ম্লানমুখ
কাঁদিবার নাই অবসর-কথা নাই, শুধু ফাঁটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মান প্রাণ, দশদিশি বিভীষিকাময়!
হেনহীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয়।
কোনো কালে তুলিব কি মাথা, জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
বলো প্রভু, মুছিবে এ আঁখি, চিরদিন ফাটিবে না হিয়া"

আজ বাংলাদেশ একটার পর একটা দূর্ণামে জর্জরিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অন্যকে দোষারোপ দেয়ার পূর্বে আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন, দ্বিতীয়তঃ মাহিমা-সাবিনা-সাবরিমা প্রমুখের ধর্ষণ তৃতীয়তঃ অনিয়মের কারণে 'ফিফার' বিশ্বকাপ থেকে বহিস্কার, চতুর্থতঃ ফার ইষ্টার্ন পত্রিকায় তালেবান প্রতিবেদন, পঞ্চমতঃ বিদেশী সরকার দূর্ণীতির অভিযোগ তুলে প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ, ৬ষ্ঠঃ কৃতি সাতারুকে পুলিশের কাষ্টডি থেকে বের করে এনে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা, সপ্তমতঃ পরপর পাল্টাপাল্টি দূর্ণীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, অষ্টমতঃ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টদের দূর্ণীতি মামলা থেকে বিনাবিচারে বেকসুর খালাস, নবমতঃ ফুটবল খেলার নামে আদম পাচার, দশমঃ বিভিন্ন মন্ত্রী- মিনিষ্টার প্রমুখের মিথ্যার যথেচ্ছারিতা, তাছাড়া রয়েছে পর পর একাধিক লোকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা ও কারাগারের ভিতরে অমানবিক অত্যাচার, সম্পত্তি লুট, জমি দখল, অফিস দখল, হাট-বাজার দখল, স্কুল দখল, বাস ষ্টেশন, লঞ্চ ঘাট, রেলপথ দখল এবং অপ্রতিরোদ্ধ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মানুষ হত্যা- এ সমস্ত ঘটনা দেশের ভাবমুর্তিকে যেমন খন্ডিত করেছে একিভাবে জাতির জন্যে বয়ে নিয়ে এসেছে বিপদ, লজ্জা ও অপমান।

তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি-

" বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,

বিপদে আমি না যেন করি ভয়'' বরং
বিপদকে যেন করিতে পারি জয় এবং আমি জানি
'' মেঘ দেখে তুই করিস নারে ভয়, আঁড়ালে তার সূর্য হাসে''।

দেশের এই ক্রমঅধঃগতিও দূর্যোগয়ময় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে সবাই মিলে প্রার্থনা করি-

''বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির সব, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান''।

২৫শে বৈশাখ ১৪০৯বাঙলা
৮ই মে, ২০০২, রিয়াদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোস্টনের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তি সংগ্রামে বোস্টন প্রবাসী বাংলাদেশীগন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরুতে ঢাকা থেকে ফিরে আসা সেখানকার কলেরা রিসার্চ সেন্টারের কতিপয় গবেষকের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরিচিতি ও সেখানে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচার বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে ছিলেন ড. উইলিয়াম গ্রীনো, ড. চেস, ড. ও মিসেস জন টেলর, ড. এল মার্টিন, ড. ডেভিড নলীন, ড. চেন। পরবর্তীকালে এঁরা Disaster in Bangladesh নামে একটি বইও প্রকাশ করেন। এঁরা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন থেকে শুরু করে বাল্টিমোর বন্দরে পাকিস্তানী জাহাজ থেকে নেমে পড়া বাংলাদেশী নাবিক ও অফিসারদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। এই গবেষকদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে বাল্টিমোরের জনস পকিন্স এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ নেন।

বোস্টনের শেখ আব্দুল ওহ্হাবের সাথে এদের পরিচয় ঢাকার কলেরা রিচার্স সেন্টারে। জাহাজ থেকে নেমে পড়াদের মধ্যে যারা বাংলা জানতেন না তাঁদের সাথে কথা বলার জন্যে ওহ্হাব সাহেবের মাঝে মাঝে ডাক পড়তো বলে তিনি জানালেন। বেগম সালমা খায়েরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সমুদ্র বন্দরে কবে কখন কোন জাহাজ পাকিস্তানের জন্যে অস্ত্র বোঝাই হবে তার খবর সংগ্রহ ও প্রচার, কিভাবে তা প্রতিহত করতে হবে সেসব প্রচেষ্টার সমন্নয় সাধন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য কাজ করতেন।

বোস্টনে তখন মাত্র দশ বারোটি বাংলাদেশী পরিবার। তাঁদের মধ্যে খোরশেদ আলম (রাষ্ট্রদূত), আমিনুল ইসলামও আমিরুল ইসলাম (দুজনই প্রকৌশলী), মরহুম ড. মাহবুবুল আলম, ড. ফজলে করিম, মুবিনুল ইসলাম চৌধুরী, মিঃ দোহা, ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, নিশাত খান, রেজা রহমান, কাজী রেজাউল হাসান, তাইয়েব উদ্দিন মাহতাব, কাজী শাহজাহান বেলাল, শেখ আব্দুল ওহ্হাব, হায়াত ইমাম, ড. সাজেদ কামাল,

ড. বিনয় পাল, খায়রুল আসাব, জহীরুল হক প্রমুখ পরিবার ছিলেন। বাংলাদেশে যখন গণআন্দোলন চলছে বিশেষত পাকিস্তানের সামরিক শাসন ইয়াহিয়া খান যখন পয়লা মার্চ ঘোষণা করলো যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না। তখন মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ৫ই মার্চ বাংলদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তিনটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১. আমেরিকান জনগনের কাছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র ও বাংলাদেশকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তুলে ধরে তাদের সক্রিয় সাহায্য সমর্থন আদায় করা।
২. সিনেটের কংগ্রেসম্যানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রভাবিত করা।

৩. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাধ্যমত আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রেরণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচিত করে তোলার লক্ষে ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ নিউ ইংল্যান্ড বাংলাদেশ সমিতি বোষ্টনে বাংলাদেশ বাটন্ বিতরণ করে। এই বাটন্ বা বোতামে বাংলাদেশের তৎকালীন পতাকা খচিত ছিলো। সমিতির প্রায় সভাগুলো হার্ভাডের পপুলেশন সেন্টার বা ডক্টর আলমের বাসায় অনুষ্ঠিত হতো।

২৫শে মার্চের সেই কালো রাত্রির পরিপ্রেক্ষিতে ড. মহিউদ্দিন আলমগীর ২৬শে মার্চ সি.বি.এস এর স্থানীয় সংবাদে বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞের ওপর বক্তব্য রাখেন। একই দিন বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে গনহত্যা বন্ধের জন্যে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি বিশেষ আবেদন পত্র প্রকাশ করা হয়। এই আবেদনে তিনজন স্বাক্ষর করেন। তাঁরা হচ্ছেন- ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, তাইয়েব উদ্দিন মাহতাব এবং ড. টমাস উইসকপ। উইসকপ হার্ভার্ডের অধ্যাপক ছিলেন। মাহতাব উদ্দিন তখন টাফট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের লোক। এই আবেদনে ড. মাহবুবুল আলমের অর্থ সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়।

মিসেস সৃজান আলমগীর এবং ড. মহিউদ্দিন আলমগীরের সহায়তায় হার্ভার্ডের তিনজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডীন এডোয়ার্ড ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টীফেন মার্গলীন- ১৯৭১ সালের পয়লা এপ্রিল একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এতে তাঁরা বলেন- The emergence of independent Bangladesh is inevitable.
একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এ প্রবন্ধটির কথা তখন থেকে বিভিন্ন সভায় উদ্ধৃত করা হতো। এপ্রিলের ১২ তারিখে বোস্টনে টেগোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতির উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন ডক্টর বিনয় পাল। বাংলাদেশ সমিতি ও টেগোর সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে তখন বোস্টনে An evening of Bangladesh Music and Dance অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. পাল এবং মিসেস পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা নিউইর্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত পন্ডিত রবি শংকর ও জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্ট এ ও যোগ দেন। এই কনসার্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় বাংলাদেশীরা মাঝে মাঝে ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভে অংশ নিতেন। ড. মাহবুবুল আলম আমেরিকা ও কানাডায় বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তাঁর স্ত্রী সালমা বলেনঃ ওতো সারারাত ফোন করে চলতো আর বাংলাদেশের খবর যেখানে যেখানে যা বেরিয়েছে, তা সংগ্রহ করে রাখতো।
ড. আলম স্থানীয় সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডি ও এডোয়ার্ড ব্রোকের কাছে প্রত্রালাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি তুলে ধরেন সিনেটর স্যাম্পবি, চেজ, মন্ডেল প্রমুখের সাথে একযোগে। এই দুই সিনেটর পাকিস্তানে মার্কিন সমরাস্ত্র সরবরাহ বন্ধের প্রস্তাব স্বাক্ষর করেন। সিনেটর কেনেডি সিনেট ত্রান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করেন।

ড. আলম ছিলেন তহবিল রক্ষার দায়িত্বে। তাঁর কাছে বোস্টনের বাঙালি ও স্থানীয় আমেরিকানরা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশীরা অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তিনি ১৯৮৪ সালে পরলোকগমন করেন। ড. আলম অত্যন্ত অমায়িক ও উদার হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন।

সে সময়কার ফাইলপত্র থেকে জানা যায়, মিড-ওয়েষ্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা গবেষক ড. এফ বি মালিক ড. আলমের কাছে ১৪৫০ ডলার পাঠিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বোস্টনের চিকিৎসক ডাঃ রেজাউর রহমান সমিতির বাংলাদেশ তহবিলে একক ভাবে ৫৭২২ডলার দান করেন। এটাই ছিলো তাঁর পুরো সঞ্চয়। নিজের দৈনন্দিন খরচের জন্যে কিছু অর্থ রাখার জন্যে তাঁকে পরামর্শ দেয়া সত্বেও তিনি সবটাই দিয়ে দেন।
এ ছাড়া বোস্টনের বাংলাদেশ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা ৪৭৮৫ ডলার দান করেন। শিকাগোর বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগের সভাপতি প্রখ্যাত স্থপতি (বর্তমানে পরলোগত) ড. ফজলুর রহমান খান ঐ এলাকা থেকে ২,৭০০ ডলার এবং কানাডায় মানিটোবা বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ড. ফরিদ শরিফ সেখান থেকে ২,০০০ ডলার সংগ্রহ করে পাঠান। এই সর্বমোট ১৮,০০০ ডলার দিয়ে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের জন্যে ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি পাঠানো হয়। এছাড়া বোস্টনের বাংলাদেশীরা তাঁদের সাপ্তাহিক আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বাংলাদেশ তহবিলে দিতেন। বোস্টন এলাকার কিছু আমেরিকানের নামও অর্থ প্রদানকারীদের তালিকায় দেখা যায়। এঁদের মধ্যে মাইকেল ব্রোনো, পিটার মসলন, এজি গিনোয়োকো, টি ই উইসকপ, জে, রেডিচাল, জে, এস নাইস, এস হার্শম্যান প্রমুখগন উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য এলাকা থেকে ব্যক্তিগতভাবে ড. আলমের কাছে যাঁরা অর্থ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের তালিকায় দেখা যাচ্ছে কানেকটিকাটের ড. কাজী আজিজুল হক ও ড. মনিরুল ইসলাম, ওহাইও র এ আর থানাদার, মিসিগানের জাকির হোসেন, ডাঃ শামসুল হক ও আনোয়ারুল হক, ওয়াশিংটনের এ এম এ মহীত, কানাডার জে আলম, ইন্ডিয়ানার মীর মেসন আলী। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে যাঁরা যোগাযোগ রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভারসিটির মি. ললিত, মিসিগানের মি. মন্ডল, মি. আনোয়ার, ডাঃ বদরুদ্দোজা, এ রশীদ হাওলাদার ডেট্রয়েটের জহুর হোসেন, কুইবেক বাংলাদেশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক নায়িম চৌধুরী, এইচ জাফর উল্লাহ্, নিউইয়র্কের ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অফ আমেরিকা র সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান ও মুজিব নগরের মেজর জব্বার (ওরফে হোসেন আলী) এর নাম দেখা যায়। এঁরা সময় সময় বিভিন্ন ধরণের চিঠিপত্রও লিখেছেন।

বাংলাদেশের পরলোকগত সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সায়িদ চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী বোস্টনের ড. মাহবুবুল আলম ও বৃহত্তর বোস্টনের বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম, ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীর, তৈয়বউদ্দিন মাহতাব, রেজাউল হাসান তাঁর সাথে নিউইয়র্কে মে মাসে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁদেরকে মুজিবনগরে ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি পাঠাতে অনুরোধ জানান। বোস্টনের বাংলাদেশ সমিতির উদ্যোগে ৯৫টি ওয়াকি-টকি, ৩৫০৪টি রিচার্জেবল ব্যাটারী, ১০টি লং রেঞ্জ কম্যুনিকেশন সেট, তিনটি ট্রান্সফরমার ইত্যাদি সরঞ্জাম পাঠানো হয়। বিচারপতি আবু সায়িদ চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী এ সবের তৎকালীন মূল্য ছিল ৮২ হাজার ৯শত ৫০ ডলার। এর মধ্যে ১৮৩১৪ ডলার বোস্টনের বাংলাদেশ সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত হয়।
বাদবাকী আসে প্রেসিডেন্ট একাডেমির প্রধান নিউহ্যাম্পয়ারের ফ্রাঙ্কলীন পিটার্স ল সেন্টার- এর প্রেসিডেন্ট ও এমআইটি র প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রবার্ট রাইমের সহায়তায়। যন্ত্রপাতিগুলো সংগ্রহে সাহায্য করেন এমআইটি র ছাত্র রেজাউল হাসান।

তখনকার আইনে বিদেশীদের এজাতীয় ইলেকট্রনিকস্ সরঞ্জাম ক্রয়ের উপর কড়াকড়ি ছিল। এ কারনে ড. রাইম নিজেই এ বিষয়ে সকল দায়িত্ব নেন। যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়ার জন্যে বোস্টনের তৈয়ব উদ্দিন মাহতাব সমিতির পক্ষ থেকে মুজিবনগরে গমন করেন। এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান সীমিত থাকায় এবং তখন সমিতির সাথে ঘনিষ্টভাবে যোগাযোগ না রাখার ফলে তারা কবি সুফিয়া কামালকে ভুল তথ্য প্রদান করেন এবং এই ভুল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুফিয়া কামাল ১৯৮০ সালের ঈদ সংখ্যা সন্ধানীতে লিখেন....এখানে

(বোস্টনে) এসে তো শুনলাম.....বাঙালির সেই চরম দুর্ভাগ্যের দিনেও এরা (বোষ্টনবাসী বাঙালি) তেমন সাড়া দেয়নি, দিয়েছে কি?

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবু সায়িদ চৌধুরী এসব যন্ত্রপাতির উপযোগীতা সম্পর্কে লিখেনঃ
এইচ এফ কম্যুনিকেশন সেট পাঠানো হয় ১০টি। এগুলোতে দশ হাজার মাইল দূরেও কথা বলা যায় এবং মরস্ কোডে সংবাদ দেয়া-নেয়া করা চলে। ৫-ওয়াট ভিএইচএফ ওয়াকি-টকি সেটে পাঁচ মাইলের মধ্যে খবর দেয়া নেয়া চলে। এগুলো পাঠানো হয় ৫০টি। তাছাড়া দেড় ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াকি-টকি পাঠানো হয়। এগুলো দুই মাইলের মধ্যে অনুরুপ কাজে লাগে। সদ্য দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশেও যোগাযোগের কাজ এগুলো দিয়েই শুরু হয়। যুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্দ এগুলো গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-জঙ্গরে ব্যবহার করেছেন.....।
এসব সরঞ্জাম পেয়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী রেজাউল হাসানকে লিখিত এক চিঠিতে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নতুন ফর্দ পাঠান।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বোস্টন প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ছিল গৌরবজনক, তাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ডাঃ রেজার উৎসর্গ, ড. আলম, কাজী বেলাল, খায়রুল ও অপু আসাব, সালমা খায়ের, খোরশেদ আলম, আমিনুল ও আমিরুল ইসলাম, ড. আলমগীর, ড. বিনয় পাল ও শ্যামলী পাল, রেজাউল হাসান, তৈয়ব উদ্দিন মাহতাব, শেখ ওহ্হাব, হায়াত ইমাম- এঁদের সবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্মরণীয়।
খায়রুল আসাব জানান- তিনি তাঁর স্কলারশীপের অর্ধাংশই মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে দান করেছেন। বোস্টনের বাঙালিদের কর্মতৎপরতার কারণেই মুক্তি সংগ্রামের সময় এখানে এসেছিলেন এম আর সিদ্দিকী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, এএমএ মুহীত ও ড. আনিসুর রহমান।

বোস্টনের বাঙালিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এদেশে জনমত গঠনে যে সক্রিয় ভূমিকা নেন তার নজির রয়েছে কেনেডি-বোক রেজুলিউশনে, হার্ভাডের বিখ্যাত ম্যাসন প্রবন্ধে। তাঁদের আর্থিক সাহায্য ও পাঠানো সরঞ্জাম মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা করেছে। বোস্টনের বাঙালির এই গৌরবজনক ভূমিকা ও অবদান ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার, এমনকি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের আগেই গঠন করেছেন *নিউ ইংল্যাণ্ড বাংলাদেশ সমিতি*- ৫ই মার্চে।

মুক্তিযুদ্ধে বোস্টন প্রবাসী বাঙালির অবদান আজও অলিখিতই রয়ে গেছে বলা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রণয়ন আবশ্যক।

হরতাল- ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুয়েষ্ট অঙ্গরাজ্য "Spirit of America" বা "Conscience of the World নামে সমধিক পরিচিত। অত্র ষ্টেটে সর্বপ্রথম শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম No taxation without representation" অত্র ষ্টেটে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা উচ্চতর ডিগ্রি দিয়ে থাকেন। এখানেই রয়েছে শিক্ষার পাদপীঠ হার্ভাড, এম. আই. টি. নর্থ-ইষ্টার্ন, টাফট্, বষ্টন, ব্রেনডাইজ, সীমন, এম-হাষ্ট, স্মিথ, ওলেস্লি, ব্যাপসন প্রমুখ স্বনামখ্যাত শিক্ষালয়। বৃহত্তর বষ্টন নগরীর অন্যতম আয় হচ্ছে শিক্ষা থেকে। বিশ্বের হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা প্রতিবছর এ ষ্টেটে আসে শিক্ষা অর্জনের জন্যে। বস্তুতঃ বৃহত্তর বষ্টনের প্রতি তিনজন মধ্যে দুজন ছাত্র আর একজন শিক্ষক। ছাত্র শিক্ষকের এক নিপুণ সমাজ গড়ে উঠেছে অত্র অঙ্গরাজ্যে। এ রাজ্যের জনপ্রতিনিধি ও ছাত্র-শিক্ষক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিলে। হার্ভাডের তিনজন শিক্ষক লেখেন .. "Emergence of an independent Bangladesh will be reality."

শোভা যাত্রার খেসারতঃ

১৯৯০ সালে এ রাজ্যের ডেমোক্রেটিক গভর্ণর মাইকেল ডুকাসিককে পরাজিত করে নির্বাচিত হলেন রিপাবলিকান দলের উইলিয়াম ওয়েল্ড। তার স্ত্রী সুজান ওয়েল্ড হচ্ছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোজবেল্টের নাতনী। কয়েক দশক পর রিপাবলিকান দল জয়লাভ করে। নতুন গভর্ণর এ্যাডুকেশন এর উপর নির্ভরশীল ম্যাসাচুচেষ্ট ষ্টেটের সরকারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বাড়িয়ে দেন, শিক্ষকদের বেতন কমিয়ে দেন এবং কয়েক হাজার শিক্ষকদের ছাটাই করার সুপারিশ করে আইন সভায় প্রস্তাব রাখেন। তার প্রস্তাবের প্রতিবাদে অত্র অঙ্গরাজ্যের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা ষ্টেট হাউজে শোভাযাত্রা করে স্বারকলিপি পেশ করেন। কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক ষ্টেট হাউজে আসেন এবং ঐ সমস্ত লোকের ভীড়ে ষ্টেট হাউজের আঙ্গিনাস্থ ফুলের চারা গাছ ও বাগান নষ্ট হয়ে যায়।

এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর সাধারণ নাগরিক, ছাত্র-শিক্ষক ও শোভাযাত্রা আয়োজকরা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্দ হয়ে ওঠেন এবং মিডিয়ার কারনে ফুলের চারা গাছ ও বাগান মুখ্য হয়ে ওঠে। ছাত্র-শিক্ষকের ন্যায্য দাবী-দাওয়া গৌণ হয়ে পড়ে। নাগরিকরা দাবী করেন যে, যারা সমাবেশের আয়োজনে ছিলেন তাদের নিজ খরচে ফুলের বাগান পূনর্বাসন করতে হবে এবং শোভাযাত্রার জন্য যদি কোন শিক্ষক নিজেদের ক্লাশ ছুটি দিয়ে থাকেন তাহলে সেই শিক্ষকদের সে সব ক্লাশ পূরণ করে দিতে হবে এবং তার জন্য কোন অতিরিক্ত বেতন বা ভাতা তারা নিতে পারবেন না। NEA (ন্যাশনাল এডুকেটার্স এসোসিয়েশন) এবং MSCA (ম্যাসাচুচেষ্ট ষ্টেট কলেজ এসোসিয়েশন) এর আয়োজনে ছিলেন, তারাই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রী ফুলের বাগান নষ্ট করায় যারা শোভাযাত্রার নেতৃত্বে ছিলেন তারা নিজ নিজ পদবী থেকে ইস্তফা দেন এজন্য যে, তারা শোভাযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন যার ফলে জনগনের করের টাকায় সৃষ্ট ফুলের বাগান নষ্ট হয়েছে। প্রতিটি যোগদানকারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা এসে বাগানটি আবার সাজিয়ে দেন। এদিকে নিয়ম-শৃংখলা লঙ্ঘন করায় স্থানীয় কোর্ট আয়োজনকারীদের জরিমানা করেন। শোভাযাত্রার উদ্যোগকারীগন তখন নিজেদের মধ্য থেকে অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করে কোর্টের জরিমানা প্রদান করেন।

ধর্মঘট হচ্ছে শেষ অবলম্বনঃ

যুক্তরাষ্ট্রে যখন কোন ইউনিয়ন বা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট বা কাজে বিরতি ঘোষনা করেন তখন শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হলে উদ্যোক্তাদের সে খরচ বহন করতে হয়। এমনকি যদি কোন অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি আয়োজন করেন তাহলে স্থানীয় পুলিশদের ভাড়া দিয়ে অত্র অনুষ্ঠানে নিতে হয়। যারা হরতালের কারণে ঘন্টা প্রতি হিসাব করে পুলিশের খরচ উদ্যোক্তাদের যোগাড় করতে হয়। তাছাড়া ধর্মঘটের কারণে যে সমস্ত কর্মচারী নিজেদের বেতন হারাবেন তাদের সংসার চালানোর জন্যে আয়োজকদের ভাতা দিতে হয়। কেউ ধর্মঘট করলে বা কাজ থেকে বিরত থাকলে তাকে কখনই বেতন দেয়া হয় না। সুতরাং যারা ধর্মঘট আহবান করেন তাদের বহু বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নতুবা আইন মেতাবেক উক্ত সংস্থাকে এবং সংস্থার নেতৃত্বকে বহু টাকা গচ্ছা দিতে হয়। ধর্মঘট হচ্ছে "Last resort" এসব করণে উন্নত দেশে ধর্মঘটের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাছাড়া ধর্মঘট করে কোন সংস্থা সাধারণ নাগরিকের জীবন-যাত্রা বিঘিন্ত করতে পারবে না।

পরাধীন মানসিকতা এখনো সোচ্চারঃ

বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন কার্যকরী আইন না থাকায় মর্জি মাফিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থে কিংবা ছলে-বলে কৌশলে ক্ষমতা দখলের জন্য হর-হামেশা ধর্মঘট, হরতাল আহবান করে থাকেন। এমন মন-মানসিকতা পরাধীন দেশের মত। হরতাল, ধর্মঘটের সময় যে সমস্ত বাড়ি,গাড়ি জ্বালানো হয় বা নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয় তার জন্য আহবানকারী সংস্থা বা দল কোন খরচ বা জরিমানা প্রদান করে না। তার ফলে যখন তখন জাতীয় সম্পদ,গাড়ি,বাড়ি জ্বালানো হয়। যারা হরতালের কারণে কাজ থেকে বিরত থাকেন তাদের ঐ দিনের বেতন কাটা হয় কিনা জানি না। তবে ধর্মঘট আহবানকারীদের, ক্ষতিগ্রস্থদের ঐ সময়ের পাওনা বেতন বা আয় দিতে হয় না। হাজার হাজার রিকশা চালক যারা ক্ষতিগ্রস্থ হন তাদেরকে কোন রাজনৈতিক সংস্থা বা দলীয় নেতা ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা দিয়েছেন কিনা জানি না। দেশের সম্পদ বিনষ্টের জন্য আজ স্বদেশে রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতা চরমে পৌঁছেছে।

মিডিয়ার দায়িত্বঃ

সংবাদপত্র সমূহ ও জাতীয় টেলিভিশন মিডিয়া দেশের সম্পদ বিনষ্ট করা যে অত্যন্ত অন্যায় এবং গর্হিত অপরাধ তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন না। কোথায় কটি গাড়ি জ্বালানো হলো, কোন লোক জ্বালিয়েছে, ঐ দলের বা গ্রুপের নেতৃত্বে কে বা কারা ছিলেন, তাদের নাম, ঠিকানা, বড় বড় হরফে ছাপানোর দায়িত্ব মনে করেন না। বষ্টনে যারা ফুলের চারা ও বাগান নষ্ট করেছিলো তাদের প্রত্যেকের ছবি টেলিভিশন নিউজে বার বার দেখানো হয় এবং জনগন তাদের ধিক্কার দেয়। তাছাড়া, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্রিমিনাল কেস্ ও করা হয়।

হরতাল বিষয়ক আইন প্রয়োজনঃ

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশের সম্পদ নষ্ট করার উস্কানী দেয়, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা দলকে সম্পদ নষ্ট করার জন্য জরিমানা করা উচিৎ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার ও বিরোধীদল উভয়কে অনুরূপ আইন

সংসদে পেশ করে পাশ করা উচিৎ। সংসদে এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা দরকার এ জন্য যে, তাতে দেশের জনগন এ বিষয়ে সজাগ হবেন। প্রতিবছর ধর্মঘট, হরতাল ও অনুরূপ ধ্বংসাত্বক কর্মকাণ্ডের জন্য দেশ কিভাবে প্রতিবছর গরীব হচ্ছে, সম্পদ হারাচ্ছে, প্রতিবছর তাদের করের বোঝা কিভাবে বাড়ছে এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বা বৈদেশিক বিনিয়োগ বিঘিন্ত হচ্ছে তা জনগনকে তথ্যভিত্তিকভাবে জানানো দরকার।

বন্যা ও ধর্মঘট ঃ

সাম্প্রতিক বন্যার জন্য বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের মতো। দেশের আহবানে সাড়া দিয়ে আজ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩৭ মিলিয়ন ডলার সাহায্য এসেছে বলে জানা যায়। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য সরকার ১৫% সারচার্জ সংগ্রহ করেছেন। সৌদি আরবে বসবাসরত সকল বাংলাদেশী প্রবাসী নাগরিকদের কাছ থেকে পাসপোর্ট নবায়ন ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত ১০রিয়াল সংগ্রহ করা হচ্ছে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরসনের জন্য। প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্নভাবে টাকা সংগ্রহ করেছেন দেশমাতৃকার জন্যে। তাদের সমূহ প্রচেষ্টায় যে টাকা উঠবে তা সাম্প্রতিক ধর্মঘটের প্রথম প্রহরেই খরচ হয়ে গেছে। তিনদিনের ধর্মঘটে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ নষ্ট হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছেন।

কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নেইঃ

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হর-হামেশা দাবী করেন যে, তারা জনগনের মঙ্গল চান, দেশের উন্নয়ন চান। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তাদের হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদির ফলে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিঘিন্ত হয়, মানুষের হয়রানির শেষ নেই। হরতাল, ধর্মঘট করে দেশের রাজনীতিবিদরা দেশটিকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যে তার ফলে বাংলাদেশের জনগনের ক্রয় ক্ষমতা প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের তুলনায় কয়েক গুন কম বেড়েছে। ২৫০ মিলিয়ন বা ১০ মিলিয়নই হোক, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা দল এবং যে সব নেতৃত্বের জন্য দায়ী তাদের যদি দেশের প্রতি সামান্যতম দরদ ও দেশভক্তি থাকে তাহলে তাদেরকে এই দূর্যোগের সময়ে সেই সম্পদ পূরণ করে দেয়া উচিৎ। নচেৎ তাদের রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া প্রয়োজন। দেশের উন্নয়নের নামে অবনতি ঘটানো মোনাফেকির নামান্তর। অন্য একজন আইন অমান্য করে, মানুষ হত্যা করে রেহাই পেয়ে গেছে; সুতরাং আমিও আইন অমান্য করবো, দেশের সম্পদ নষ্ট করবো, নেতৃত্বের কাছ থেকে জাতি তা আশা করে না। অন্যদল ধর্মঘট করেছে, সুতরাং আমাদেরও করতে হবে...কুকুরে কামড় দিয়েছে, সুতরাং নিজদের কামড় দিতে হবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ধর্মঘট-হরতালের রাজনীতি পরিহার করুনঃ

সরকারের নীতিমালার বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অনুচিৎ নয়। তবে দেশের ক্ষতি করে, সম্পদ বিনষ্ট করে, জনগনের জিল্লাতি বাড়িয়ে প্রতিবাদ করা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ দেশ নিজের, এ দেশের প্রতিটি সম্পদ নিজেদের-একে ধ্বংস করার অধিকার কোন রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বকে জনগন দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমেরিকার এসইএ এবং এমএসসিএ সংস্থা সমূহের স্থানীয় নেতৃত্ব, তাদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে জনগনের করের পয়সায় সৃষ্ট ফুলের বাগান নষ্ট হওয়ায় পদবী থেকে শুধু ইস্তফা দেননি বরং তারা সম্পদ নষ্ট করা যেন না হয় তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ

গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল বা নানাবিধ সংস্থা সমূহের নেতৃত্ব এ বিষয়ে কি অনুতপ্ত ও সজাগ।

তারা কি তাদের পদবীতে ইস্তফা দেবেন? ম্যাসাচুচেষ্টে সর্বমোট ক্ষতি হয়েছিলো দেড় হাজার ডলার। আমেরিকা ধনী দেশ। এর জি-ডি-পি বাংলাদেশের জি-ডি-পি থেকে ২৬১ গুণ বেশী। কিন্তু পাবলিক, সম্পদ নষ্ট হওয়ায় সোচ্চার হুংকার শুরু হয় যার ফলে একাধিক নেতৃত্ব পদে ইস্তফা দেন। বাংলাদেশের ক্ষতি হয়েছে ২৫০ মিলিয়ন ডলার। দরিদ্র দেশের জন্য এ বড় লজ্জার বিষয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ হরতাল, এ ধর্মঘট দেশের বা জনগনের উপকারের জন্য নয়। নিছক পদ্ধতিতে ঘৃণ্য কৌশলে নিজের ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য, সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য। বর্তমান সরকার যদি দেশের জনগনের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যর্থ হয় তাহলে আগামী নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হবে। সুতরাং ঘৃণ্য পথে দেশের সম্পদ নষ্ট করে জনগনের জিল্লাতি বাড়িয়ে ক্ষমতা দখলের হরতাল যুক্তিযুক্ত কি?

মিছকিনের রাজাঃ হায়রে! হতভাগা দেশঃ

মোটকথা, ধর্মঘট, হরতাল, শোভাযাত্রায় রাজনীতি পরিহার করে, দেশ গড়ার রাজনীতি গ্রহণ অপরিহার্য। তা না হলে বাংলাদেশ যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশ উন্নয়নের আস্বাদ গ্রহণ করেছে। আর বাংলাদেশ বিশ্বের দশতম বৃহৎ দেশ হয়েও চির-অবহেলিত, মিছকিন নামে পরিচিত। তাদের জাতীয় জীবনে শুধু রয়েছে হরতাল, ধর্মঘট, বন্যা, সাইক্লোন আর দারিদ্রের হাহাকার। তাদের নেতা-নেত্রীরা ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও ধর্মীয় অনুকাজে আসেন সৌদি আরবে খয়রাতির টাকায় নিজেদের মান-সম্মান-লজ্জা, লজ্জা-শরম সব জলাঞ্জলি দিয়ে মিছকিনের রাজা হিসাবে। আর এদিকে লক্ষ-কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে ধর্মঘট আহবান করেন। জাতি কি থু-থু দেবে এদের মুখে?

দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রয়োজনঃ

যারা সরকারে আছেন আর যারা সরকারের বাহিরে আছেন তাদের জেনে রাখা ভাল যে, বহুদলীয় গনতান্ত্রিক সভ্য রাষ্ট্র সমূহে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে সার্বক্ষণিক বাক-বিতণ্ডা হয়। কিন্তু জাতীয় সম্পদকে বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই। যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় কনজারভেটিভ পার্টি বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দলীয় রিপাবলিকান পার্টি যদি শোভাযাত্রা আহ্বান করে একটিও গাড়ি জ্বালায় কিংবা পথচারীদের স্বাভাবিক চলাফেরার অসুবিধা সৃষ্টি করে তাহলে প্রবল মিডিয়ার চাপে তাদের ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আর ক্ষতিপূরণতো দিতেই হবে। তাদের আইন পরিষদের সদস্যরা এভাবেই আইন সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশের যে সমস্ত দল বা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে ধর্মঘট বা হরতাল আয়োজন করে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা হচ্ছে সেই দলকে ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিৎ। সেই সাথে জনগনের কাছে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ এবং করজোড়ে প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ যে তারা আগামীতে যাতে দেশের সম্পদ নষ্ট না হয় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। একই সাথে নিজের দলের যে সমস্ত সদস্য বা নেতা শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে দল থেকে বহিস্কার করা উচিৎ। তবেই তারা নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকতে পারেন। নচেৎ তাদের রাজনীতি থেকে দেশের ও দশের

সাফল্যের জন্য অবসর নেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় মিডিয়া এ ব্যাপারে তৎপর হলে দেশের অনেক সম্পদ হরতাল ও ধর্মঘটের কারনে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে বৈ কি। দেশের জন্য আজ দরকার দায়িত্বশীল নেতৃত্বের রাজনীতিতে, মিডিয়াতে, শিক্ষাঙ্গনে সর্বত্র।

বাংলাদেশ ও আমেরিকা

দুই দেশে দুই নিয়ম

বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে মিলের চেয়ে গড়মিলই বেশী। ও দেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ডলার। ও দেশে লোকে ডানে গাড়ি চালায়, বাংলাদেশে বায়ে। ওখানে কোথাও গাড়িতে হর্ণ বাজায় না! কিন্তু বাংলাদেশে গাড়ির হর্ণের আওয়াজে মাথা যায় বিগড়ে। ওখানে আপ করলে বাতি জ্বলে, ডাউন করলে বাতি নিভে যায় বা বন্ধ হয়- বাংলাদেশে তার উল্টো। ওখানে যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে- তার কাজ হবে আগে। নোবেল লোরেট, গভর্ণর, কংগ্রেসম্যান- সবাইকে একই নিয়ম মানতে হয়; কিন্তু বাংলাদেশে তার উল্টো। বাংলাদেশে ভি, আই, পি / ভি, ভি, আই, পি দাসত্বের মানসিকতা জাতির প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে আছে। ওখানে টি,ভি-রেডিওর নিউজ হচ্ছে নিউজ ভ্যালুর উপর নির্ভরশীল আর বাংলাদেশে পদবী ও ক্ষমতার উপর। ওখানে লোকে সহজে মিথ্যা বলে না, কাজে ফাঁকি দেয় না কিন্তু বাংলাদেশে কাজে ফাঁকি দেয়া, মিথ্যা বলা নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়ম। ওখানে প্রত্যেকে স্ব-স্ব কাজ নিয়ে ব্যস্ত, অন্যের কাজে মাথা ঘামায় কম- বাংলাদেশে নিজের কাজে মন নেই, অন্যের কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত। ওদেশে হরতাল-ধর্মঘট নেই, অত্যাবশ্যকীয় জীবন-যাত্রায় কোন ব্যাঘাত নেই- বাংলাদেশে তার পূরো উল্টো। যখন তখন দেশটি ধর্মঘট এবং হরতালকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে ওঠে। এক সময় বর্গীদের ভয়ে দেশবাসী পালিয়ে বেড়াতো আর এখন হরতালকারীদের ভয়ে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, মান-ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

সরকারী অফিস ও কর্মচারীঃ

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্মচারীদের প্রভাব হচ্ছে নূন্যতম- রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব হচ্ছে সর্বোচ্চ। সকল ধরণের সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকার হচ্ছেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। যেমন ধরুন, শহরের প্রধান হচ্ছেন নির্বাচিত মেয়র। তিনি পুলিশ, স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্ট বা অন্যান্য সকল কর্মচারীর নিয়োগ বেতন নির্ধারণ ও বরখাস্তের সিদ্ধান্তের অধিকারী। শহরের টাকা কীভাবে এবং কি কি বাবদে খরচ হবে তার সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা- গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট বা মেয়র নয়। গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট বা মেয়র সুপারিশ করতে পারেন, প্রস্তাব পেশ করতে পারেন, তবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশে তার উল্টো।

যুক্তরাষ্ট্রের সব অফিসেরই বড় সাহেব হচ্ছেন নির্বাচিত ব্যক্তি বা পলিটিক্যালী এপয়েন্টেড..... কোন ব্যক্তি বিশেষ। যতোদিন মেয়র সাহেব বা গভর্ণর সাহেব বা প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর গদিতে থাকবেন ততোদিন ওনার ইচ্ছার উপর তাঁর চাকুরীও থাকবে। যেদিন ওনি চলে যাবেন, সেদিন অফিসের বড় বড় সাহেবদেরও চলে যেতে হবে। বাংলাদেশে তার বিপরীত-মন্ত্রী-মিনিষ্টার, মেয়র চলে যেতে পারেন, সরকারী কর্মচারী নির্ঘাত থাকবেন। তার সরকারী চাকুরি চিরস্থায়ী কেউ তা নিতে পারবে না। বরং বাংলাদেশে সরকারী চাকুরি পাওয়া যতো কঠিন তার চেয়েও অনেক গুণ কঠিন হচ্ছে চাকুরি যাওয়া। যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু অফিসের বড় সাহেব রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত সেজন্য তিনি তার সরকারের সময়ে সমূহ উন্নতি যাতে হয়, জনগন যাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তার সরকারের বিরুদ্ধে ভোট না দেয়, তার জন্য তিনি দিন-রাত খাটেন। তার সময়কালে যাতে অত্র বিভাগের সমূহ উন্নতি হয় তার জন্য তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই।

জনগনের করের টাকা যাতে অপচয় না হয় তাতে তিনি সদা সচেষ্ট। যেমন ধরুন- ম্যাসাচুচেষ্ট অঙ্গরাজ্যে যদি আপনি সরকারী চাকুরি করেন তাহলে অফিসের ফোন থেকে নিজ বাসায় ফোন করলে প্রথমতঃ তার খরচ আপনাকেই দিতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ ফোন করছেন ততো মিনিটের বেতন আপনার বেতন থেকে কাটা যাবে এজন্য যে, জনগনের পয়সায় চাকুরি করার সময়ে বাড়ির কাজে সময় নষ্ট করা নিষিদ্ধ। এমনকি যদি বাড়ি থেকে অফিসে ফোন আসে তাহলে ঐ ফোনে যতক্ষণ আলাপ করেছেন ততক্ষণের বেতন কাটা যাবে। সরকারী গাড়ি বা কোন কিছুই নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ উল্টো। জনগনের টাকার বাড়ি, গাড়ি, ফোন, সম্পদ সবই যথেচ্ছ ব্যবহার করা শুধুই সরকারী কালচার নয়, অনেকটা যেন পৈত্রিক সম্পত্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোন ব্যাংকার আইন বহিঃর্ভূতভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে অধিক ঋণ প্রদান করেন এবং ঐ ব্যক্তি ঋণ খেলাপী হয়, তাহলে তার চাকুরী যাবে। বাংলাদেশের একজন রাজনীতিবিদের ছেলেকে হঠাৎ করে বাংলাদেশের ব্যাংকাররা ১০ কোটি টাকা ঋণ দেন- ঐ ব্যাংকারদের চাকুরী যায়নি তাতে শুধু সরকারের বদনাম হয়েছে। অর্থ্যাৎ বাংলাদেশে "Individual Responsibility" নেই ঢালাওভাবে দোষারোপই মুখ্য। গেল ১৬ই অক্টোবরে যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ইকোনোমিষ্ট ম্যাগাজিনে চাকুরীর জন্যে একটি নোটিশ বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কানাডার টরেন্টো ও ব্রাজিলের সাও পোলোর জন্যে দুজন কনসাল জেনারেল এবং ভারতের বোম্বে এলাকার জন্য একজন ডেপুটি হাই কমিশনারের চাকুরী খালি হবে। যে কোন ব্রিটিশ নাগরিক ঐসব চাকুরির জন্যে দরখাস্ত করতে পারবেন।

এতোদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সব পর্যায়ের চাকুরীর জন্যে এমন দরখাস্থ আহবান করা হতো- যুক্তরাষ্ট্রের ডিপ্লোমেটিক মিশনে বা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যারা উচ্চ পদবীতে চাকুরি করেন, তাদের প্রায় ৮০% ভাগ অনুরূপ ভাবে নিযুক্তক্যাডার সার্ভিসের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ উল্টো- সরকারী চাকুরী, সেটা দেলে হোক আর বিদেশে হোক- সবগুলোই ক্যাডার সার্ভিস থেকে হতে হবে।মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ব্রিটিশ জাতের কাছ থেকে আমরা অনুরুপ ক্যাডার সর্বস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করেছি। তাদেরও চিত্র বদল হচ্ছে- আমরা মোটেই বদলাইনি। বদলানোর জিন্তাও করছি না। তার ফলে স্বদেশের আমলাতন্ত্র বা সরকারী দপ্তরসমূহ ইনইফিসিয়েনসির বা অদক্ষতার আঁধার হয়ে উঠেছে। যে কোন সরকারের পক্ষে এইরুপ কর্মচারী দিয়ে দেশ শাসন সহজ নয়।

বাংলাদেশের আই, জি বা পুলিশ কমিশনার পুলিশ থেকে হবেন

বাংলাদেশের প্রচলিত নিয়মে পুলিশের আই. জি বা জেলার পুলিশ কমিশনার পুলিশের অফিসারদের মধ্যে থেকেই হয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে এর পুরো উল্টা। বষ্টনের নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নতুন পুলিশ কমিশনার নিয়োগকরবেন। সারা দেশ জুড়ে দরখাস্থের জন্য আহবান জানান- যে কোন আমেরিকান নাগরিক বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট দরখাস্থ করতে পারবেন। দরখাস্থ কারীদের মধ্যে থেকে তিনজনকে বাছাইকরা হয়। এদের একজন হচ্ছেন উকিল, একজন হচ্ছেন অধ্যাপক এবং অন্যজন একটি বড় শহরের বর্তমান পুলিশ কমিশনার। উকিলও অধ্যাপক কোন দিন পুলিশের চাকুরী করেননি। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তাদের জন্যে বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর দেয়ার জন্যে আয়োজন করা হয়। স্থানীয় রেসিডেন্ট তাদের প্রশ্ন করেন তারা পুলিশ কমিশনার নিয়োজিত হলে কী কী করবেন, কি ভাবে ক্রাইম দূর করবেন ইত্যাদি। অতঃপর প্রত্যেক রেসিডেন্ট যারা সভায় উপস্থিত ছিলেন তারা তাদের রেটিং কাগজে লিখে বাক্সে রেখে যান। মেয়র সাহেব সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট পান তাকে পুলিশ কমিশনার নিয়োগ

করেন। যিনি নিয়োজিত হলেন তিনি হচ্ছেন একজন আইনজীবি। যিনি এরপূর্বে কখনও পুলিশের চাকুরি করেননি। আমাদের দেশে বর্তমান মন-মানসিকতায় তা কল্পনাতীত।

বাংলাদেশের গর্ব হচ্ছে বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিক জনাব ওসমান সিদ্দিক। তিনি এশিয়ার প্রথম এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত হয়েছেন। তার পূর্বে এশিয়ার কোন ব্যক্তি বা কোন মুসলমান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হননি। তিনি পেশাজীবি হিসেবে একজন ক্ষুদ্র ট্র্যাভেল এজেন্ট। কিন্তু তার মেধা ও প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায় তিনি রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। বিশ্বের যতো সফলকামী বড় বড় কূটনীতিক রয়েছেন যেমন ধরুন- হেনরি কিসিঞ্জার, প্রফেসর গলব্রেথ, উইলি ব্রেন্ট, কিং হোসেন (জর্ডান), কিং হাসান (মরক্কো), ইয়াসির আরাফাত, জন হলব্রোক প্রমুখ এরা কেউই ক্যাডার ডিপ্লোমেট নন।

বাংলাদেশের মন্ত্রী আর আমেরিকার মন্ত্রীর রিয়াদ সফর ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমেরিকার বানিজ্যমন্ত্রী অক্টোবর মাসে এক দিনের সফরে রিয়াদ আসেন। দুই জনই শুক্রবার রাতে আসেন এবং শনিবার রাতে চলে যান। আমেরিকান মন্ত্রী রিয়াদে অবস্থান কালে ১৪টি এপয়েন্টমেন্টে মিলিত হন। রাজা, উপ-রাজা, একাধিক মন্ত্রী, এমনকি সৌদি টেলিকম এর কর্মচারীবৃন্ধ এবং চেম্বার প্রতিনিধিদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের মন্ত্রী শুধুমাত্র সউদী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আমেরিকার মন্ত্রীর সৌদি সরকারের রাজা, মন্ত্রী তাদের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ৯টায় স্থানীয় আমেরিকানদের সাথে প্রাতঃরাশে মিলিত হন।

তিনি দুই মিনিট বক্তৃতা দেন এবং বলেন, আমি আপনাদের ট্যাক্সের টাকায় সৌদি আরব এসেছি এবং আমার সাথে ১২জন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রয়েছেন যারা নিজের খরচে এসেছেন। আমি এদেশের সরকারের সাথে দেখা করার পূর্বে যেহেতু আপনারা অনেকদিন যাবৎ এখানে আছেন সেজন্য প্রথমে আপনাদের সাথে দেখা করে যে বিষয়গুলো আমি উত্থাপন করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে আপনাদের মতামত ও সুপারিশ চাই। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও আমেরিকা সৌদি আরবের বহু পুরানো বন্ধু এই প্রেক্ষিতে আপনারা আপনাদের সুপারিশ রাখবেন, যাতে আমাদের সম্পর্ক আরো দৃঢ়তর হয়। অতঃপর তিনি যে বিষয়গুলো আলোচনা করবেন তা সবাইকে পড়ে শোনান। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কর্মচারীরা কাছে ছিলেন, কিন্তু তারা কোন বক্তব্য রাখেন নি।

অপরদিকে বাংলাদেশের মন্ত্রী-মিনিষ্টার যখন আসেন তখন প্রথমতঃ তাদের আগমন বার্তা গোপন রাখা হয়। যদি তা জানা হয়ে যায় তাহলে তাদের রাজনৈতিক দলসমূহ যাবার প্রাক্কালে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। তাতে স্থানীয় নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা রাখেন, রাষ্ট্রদূত বক্তৃতা রাখেন, মন্ত্রী সাহেব লম্বা বক্তৃতা করেন। কিন্তু কী কী বিষয়ে এদেশের সরকারের সাথে আলাপ করতে এসেছেন বা কী আলাপ হয়েছে তা কিছুই জানান না। স্থানীয় প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে সুপারিশ বা মতামত প্রহণ করা তাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের হয়তো ধারণা যে প্রবাসীরা কিছুই বুঝেনা, কিছুই জানেন না। তারা আবার ডিপ্লোমেসির মারপ্যাচ কী জানে?! তারা স্বদেশে টাকা পাঠাচ্ছে, তাই নিয়ে থাকুক। তারাতো বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারী নয়, সুতরাং তারা কী ই বা বুঝে?! তা ছাড়া তাদেরতো ভোটের অধিকার নেই, সুতরাং Just foget them.

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে ধর্মের আদব-কায়দা

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ইসলামের আদব-কায়দা ও অনুশীলনে যথেষ্ট সুক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ১২ই রবিউল আউয়াল উদ্‌যাপন, মৃত্যুর পর চল্লিশা করা বা কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করা, পীরফকিরের সাগরেদ হওয়া, মাজারে মোমবাতি দেয়া, শবে-বরাত পালন, ফাতেহা ইয়াজদাহম পালন, ওরশ মোবারক, মিলাদ-মাহফিল বা ওয়াজ-নসিহত করা সাধারণত হয়ে থাকে। সঙ্গত কারনেই এগুলো সৌদি আরবে মোটামোটিভাবে নিষিদ্ধ। এদেশের কোথাও ভারতবর্ষের মতো বা বাংলাদেশের মতো রাস্তা দখল করে বা মসজিদে মাইক্রোফোন ব্যবহার করে ওয়াজ-নসিহত বা মিলাদ মাহফিল হয় না। বরং এগুলো কেউ করতে গেলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলে দিতে পারে। সৌদি আলেমদের মতে, রসুল (সঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল উদ্‌যাপন করতে মানা করেছেন। দেশে শিখে এসেছি যে রসুল (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু উভয় দিনই হচ্ছে ১২ই রবিউল আউয়াল। এখানে এসে জানলাম যে, তাঁর মৃত্যু দিবস হচ্ছে ১২ই রবিউল আউয়াল, তবে জন্মদিবস কোনদিন সে সম্পর্কে কোন সহি তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সৌদি আরবে ১২ই রবিউল আউয়াল বা সবেমেরাজ, ১০ই মহররম বা আশুরার জন্যে কোন সরকারি ছুটি দেয়া হয় না। এদেশে শুধু দুটো ঈদের ছুটি দেয়া হয়। ধর্মানুগ হলেও এদেশে ধর্মাচারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।

নামাজ: এদের পদ্ধতি অনেক সহজ

এদেশের অধিকাংশ লোক মসজিদে নামাজ পড়ে। এতে নাকি ২৭ গুণ বেশি নেকি পাওয়া যায়। এদের মতে, রসুল (সঃ) ঘরে একাকী নামাজ পড়া অপছন্দ করতেন, জামাতে পড়তেই আদেশ করেছেন। ফরজ নামাজ মাইকে পড়া হয়। আজানও মাইকে হয়। তবে ফরজ নামাজ শেষ হলেই মাইক বন্ধ। ধর্মের ওয়াজ-নসিহত মাইকে হয় না কারণ এর ফলে অন্য লোকের অসুবিধা হতে পারে। যতক্ষণ ফরজ নামাজ হয় ততক্ষণ সকল দোকান-পাট, অফিস-আদালত বন্ধ থাকে। ফরজ শেষ হলেই দোকান-পাট, অফিস-আদালত চালু হয়। আমাদের দেশে তা নেই বললেই চলে। আামাদের দেশে অনেকেই নামাজের জন্যে ঘন্টাখানেক বিরতি নেন, সৌদি আরবে যা ১০/১৫ মিনিট মাত্র।

জামাতের নামাজ সংক্ষিপ্ত হয় :

এদেশের প্রতিটি মহল্লায় মসজিদ আছে এবং একই মসজিদে মূল জামাতের পরও জামাত হয়। দেরীতে আসার কারণে যারা প্রথম জামাত মিস করেন তারা সাথে সাথেই নতুন জামাত শুরু করেন। যে কেউ ইমামতি করেন এবং যিনি একামত দেন, প্রায় ক্ষেত্রে তিনিই ইমামতি করেন। এদেশে সুরা ফাতেহা পড়া শেষ হলেই মোক্তাদিরা উচ্চস্বরে আমীন উচ্চারণ করেন। আমাদের দেশে এটা নীরবে করা হয়। এদেশে ইসলামিক বিধান অনুযায়ী দুজনে জামাত করে নামাজ পড়া অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি যোগ দিলে

ইমাম হেঁটে সামনে চলে যান (যদি জায়গা থাকে) নতুবা মোক্তাদি হেঁটে পেছনের সারিতে চলে যান যাতে নতুন ব্যক্তি এক কাতারে দাঁড়াতে পারেন। নামাজ চলাকালে যদি কোনো ব্যক্তি সামনের কাতার থেকে চলে যান তাহলে পাশের বা পেছনের কাতার থেকে নামাজীরা হেঁটে এসে সে স্থান পূরণ করেন কেবলামুখী হয়ে।

টুপি পরা ধর্মের অপরিহার্য অংগ নয় :

আমাদের দেশে টুপি আছে কিনা তা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক বাধ্য-বাধকতা করা হয়। এদেশে এর কোন বালাই নেই। অনেক সময় কর্তব্যরত পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্য বুট জুতা পরে নামাজ পড়তে দেখা যায়। কোন কোন ইমাম চামড়ার মোজা পরেও নামাজ পড়ান। এদেশে ঈদের নামাজ হয় ফজরের পরপরই। রেডিও, টিভিতে আমাদের দেশের মতো অতিরিক্ত ঘটা করে বিশেষ ঈদ উৎসব পালিত হয় না। আমাদের দেশে ঈদ উপলক্ষে দৈনিক পত্র-পত্রিকা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ থাকে। দুনিয়ার কোন দেশে এমনটি হয় না। খৃষ্টানদের দেশে বড় দিন উপলক্ষেও পত্র-পত্রিকা বন্ধ থাকে না।

মসজিদে নিয়মিত কোরআন পাঠ:

ছোটবেলায় জেনেছিলাম যে, আছরের নামাজের পর বা মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ নাামাজের আগে সুন্নত নামাজ পড়া যাবে না। এ দেশে প্রায় প্রত্যেক মসজিদে ঢুকেই দুই রাকাত সুন্নত পড়ে। আমাদের রসুল (সাঃ) নাকি এভাবে পড়তেন। আমাদের দেশে আজানের প্রায় সাথে সাথেই মাগরিবের নামাজ শুরু হয়। এদেশে প্রতিটি আজানের প্রায় ১৫ মিনিট পর ফরজ নামাজ শুরু হয় বা জামাত শুরু হয়। তারপূর্বে মসজিদে পৌঁছলে লোকেরা প্রথমতঃ ২ রাকাত সুন্নত পড়ে এবং বাকি সময় সাধারণত কোরআন তেলওয়াত করে। এদেশের প্রত্যেক মসজিদে শত শত কোরআন শরিফ থরে থরে সাজানো থাকে। মসজিদে গিয়ে অনেকেই কোরআন পাঠ করেন।

সফরের নামাজ:

এদেশে সফরের সময় শুধু যে নাামাজ ছোট করা হয় তা নয়, এমনকি একই সাথে দু-তিন ওয়াক্তের নামাজ একসাথে পর পর আদায় করা হয়। যেমন ধরুন গাড়িতে চলেছে কেউ-জোহরের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী কোথাও থেমে জোহরের ৪ রাকাতের পরিবর্তে ২ রাকাত কসর শেষ করেই আছরের ৪ রাকাতের পরিবর্তে আরও ২ রাকাত কসর নামাজ পরপর আদায় করে সফরের দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে এমনটি বিশেষ চোখে পড়েনি।

তারাবির নামাজ:

তারাবির নামাজ এদেশে সাধারণত ৮ বা ১০ রাকাত পড়া হয়। রিয়াদ শহরের কয়েক শত মসজিদের মধ্যে শুনেছি শুধু গুটিকয়েক মসজিদে ২০ রাকাত তারাবি হয়। তবে মক্কা এবং মদিনা শরিফে সব সময় ২০ রাকাত তারাবি হয়। কোন কোন মসজিদে যেখানে খতম তারাবি হয় সেখানে ইমাম সাহেবরা হাতে কোরআন শরিফ নিয়ে তা থেকে দেখে দেখে নামাজ পড়ান এবং বহু মোক্তাদি কোরআন হাতে নিয়ে ঈমামের সাথে নীরবে তা পড়ে থাকেন। বাংলাদেশে এমনটি কখনো দেখিনি।
তাছাড়া রমজান মাসের শেষ দশদিন গভীর রাতে কিয়ামের নামাজ হয় এবং ঐ নামাজে এক এক রাকাতে প্রায় এক এক সিপারা শেষ করা হয়। এসব নামাজে অনেকে নরম মোজা পরে নামাজ পড়েন কারণ প্রতি রাকাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এদেশে আমাদের দেশের মতো প্রত্যেক মসজিদে জুম্মার নামাজ হয় না। নির্দিষ্ট জামে মসজিদগুলোতে কেবল জুম্মার নামাজ হয়। এদেশে সূর্যগ্রহণ হলে গ্রহণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো ঘন্টা দু-তিনেক নিয়ে দুই রাকাত নামাজ জামাতে পড়া হয়। আমাদের দেশে সূর্যগ্রহণে নামাজ পড়ার বিধানটা অগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

নামাজের অন্যান্য কটি বিষয়:

এদেশে অজুটাকে অনেক সহজ মনে হয়। এরা হাত মুখ ধোয়, তবে পায়ে জুতা-মোজা থাকলে কখনও শুধুমাত্র মাসেহ্ করে নেয়। ছোট বেলায় আরবীতে নামাজের নিয়ত মুখস্ত করতে আমাদের বাধ্য করা হতো। তখন জানতাম যে, নিয়ত আরবীতে না করলে নামাজ হবে না। এদেশে নিয়ত উচ্চারণে কড়াকড়ি নেই- আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞানী ও সর্ব-ইন্দ্রিয়। তিনি মনের কথাও জানেন। সুতরাং যে মসজিদে এসেছে সে নামাজ পড়তেই এসেছে। আল্লাহ তা জানেন। আমাদের দেশে নামাজ শেষ হলে ঈমাম সাহেব প্রথমে ডানে সালাম ফিরান, মোক্তাদিরাও সাথে সাথে ডানে সালাম ফিরান, বাঁয়ে ফিরালে মোক্তাদিরা তাই করেন। এদেশে ঈমাম ডানে-বাঁয়ে সালাম ফিরানো সম্পূর্ণ শেষ হলে মোক্তাদিরা প্রথমে ডানে ও পরে বাঁয়ে সালাম ফিরান।

দোয়ার বাধ্যবাধকতা নেই:

আমাদের দেশে নামাজ পড়া শেষ হলেই ঈমাম সাহেব সবাইকে নিয়ে হাত তুলে মোনাজাত করেন। এদেশে ঈমাম সাহেব মোনাজাত করেন না। কারণ নামাজই দোয়া। সুরা ফাতেহা-ই সবচেয়ে উত্তম দোয়া।

আদব-কায়দা: মন্ত্রী এলেও দাঁড়ায় না

এদেশে সবাই একে অপরকে সব সময় সালাম দেয়। কেমন আছো জিজ্ঞেস করলেই বলবে- আলহামদুলিল্লাহ্। যিনি হাতের ডানে রয়েছেন, তিনিই প্রথম যাবেন। বুড়ো বা জোয়ানের পার্থক্য নেই। আমাদের দেশে মিটিং-এর আগে বা মিটিং চলাকালে আফিসের কর্তাব্যক্তি বা মন্ত্রী সাহেব উপস্থিত হলে

সবাই দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখান। এদেশে এটা চোখে পড়েনি। কারণ আল্লাহ্‌র নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মজলিসে এলে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখাতে বারণ করেছেন। ইসলামের বক্তব্য হলো-আল্লাহ্‌ ছাড়া সম্মানের প্রাপ্তি কারো নেই।

মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ:

এদেশে কারো মৃত্যু-সংবাদ এলে ঐ বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত হয়ে নীরবে কোরআন শরিফ পড়বে। চিৎকার দিয়ে কান্না এরা পছন্দ করে না। এরা মৃত্যুটাকে খুব সহজে গ্রহণ করে। কোনো আক্ষেপ নেই। বলে-আল্লাহ্‌ দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভালোর জন্য নিয়ে গেছেন, তিনি সর্বজ্ঞানী।

বিয়ে-শাদী: পর্দা

এদেশের বিয়ে-শাদীতে পুরুষ ও মেয়েরা আলাদা আলাদা বসে। এদেশের মহিলারা পুরুষদের সামনে ঘোমটা দিয়ে চলে। চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। অনেকের চোখ ও দেখা যায় না *আবায়া* বা বোরকার কারণে। তবে অন্দর মহলে বা মহিলাদের সামনে এরা স্বল্প পোষাকে চলে।

এখানে শবে বরাত পালিত হয় না:

এ দেশের লোকজন *শবে বরাত* পালন করে না। তাহলে আমরা কোথা থেকে ধর্মীয় সংস্কৃতি পেয়েছি যে, শবে বরাতের রাতে সারারাত সজাগ থেকে মাজারে মোমবাতি ও জিয়ারত করার অনুশীলন শিখলাম? অনেকের ধারণা ভারতবর্ষের মুসলমানরা এটা সংগ্রহ করেছে হিন্দুদের *দেওয়ালি পূজা* থেকে।!

পীর ফকির মাজার এরা শিরক মনে করেন:

এদেশে পীর ফকির নেই, মাজার নেই। এরা পীর ফকিরের মুরিদ হওয়া *বিদআত* মনে করে। কারণ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেহ গ্রহণীয় নয়। এদেশে রসুল (সাঃ) আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর রওজা মোবারক মদিনায় নববি মসজিদে সংরক্ষিত আছে। তবে অন্য কারো কবর এরা বাঁধাই করে না এবং চিহ্ন ও রাখে না। এরা মাজার অপছন্দ করে। এদেশে পীর ফকির নেই এবং এরা মনে করে পীর ফকিরের সাহায্য চাওয়া, বিশেষ করে মাজারে গিয়ে কিছু চাওয়া শিরক।

হজ্ব ও হাজী-আলহাজ্ব লেখা অন্যায়:

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত রীতি আছে যে, কেউ হজ্বব্রত পালন করলে তাকে হাজ্বী বা আলহাজ্ব বলা হয়। তাদের নামের আগে আলহাজ্ব লিখা হয়। সৌদি আরবে কেহ আলহাজ্ব বা হাজ্বী লিখে না। এরা বলে লোক দেখানোর জন্যে হাজী বা আলহাজ্ব লিখলে তার হজ্ব সহি হবে না। এটা ইসলাম বিরোধী। হজ্ব হচ্ছে মুসলমানদের সর্বশেষ রোকন। যারা শারিরীকভাবে এবং আর্থিকভাবে সক্ষম তাদের জন্যে জীবনে একবারই হজ্ব করা

অর্থ্যাৎ আল্লাহ্‌র অতিথি হিসাবে অবস্থান করা ফরজ। রসুল (সাঃ) জীবনে একবারই হজ্ব করেছেন। যদি বাহবা অর্জনের জন্যে হজ্ব করা হয় তাহলে তা হজ্ব হয় না। কারণ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং এদের মতে নামের আগে হাজী বা আলহাজ্ব লেখা যুক্তিযুক্ত নয়।

সৌদি আরব ইসলামের পাদপীঠ। যারা এক আল্লায় বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে, ধর্মকে নিজের স্বার্থে বিক্রি করে না। এবং সৎকর্মশীল তারা সবাই বেহেশতে যাবে। এরা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন ধরনের রীতিনীতিকে যেমন পীরের সাগরেদ হওয়া, মাজারে বাতি বা শিরনী দেয়া, ইত্যাদিকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে না। কোরআনে বর্ণিত আছে- কিতাবধর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিনম্রচিত্তে বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তোমদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে (তাহার প্রতি) ও তাহাদের প্রতি যাহা নাজেল হইয়াছে (তাহার প্রতি) যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সমূহ স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না, তাহাদের জন্যে রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার (সুরা বাকারা)।

আমাদের দেশে ধর্মের আদব-কায়দা ও অনুশীলন মূলত এসেছে বাগদাদ ও পারস্যের রাজা-বাদশাহ্‌ বা আরব বনিকদের মাধ্যমে। ইসলাম ধর্ম প্রচারে অতি স্বল্প-সংখ্যক আলেমই আমাদের দেশে এসেছিলেন এবং এ কারণেই আমাদের অনুশীলনের সাথে কিছুটা পার্থক্য দেখা দেয়।

মহান আল্লাহ্‌ সুবহানা তায়ালার মহিমা বোঝা বড় কঠিন, বিনম্র ও স্বজ্ঞানী না হলে। আমাদের দেশে অনেক সময় ধর্মের অহংকারে আমরা স্বজ্ঞান ও বিনয়ীভাব হারিয়ে ফেলি এবং এর ফলে অজ্ঞতা আমাদের অহংকারী করে তোলে। সম্প্রতি দেশীয় বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ যে, দেওয়ানবাগ পীর সাহেব চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ্‌ ও রসুল (সাঃ) কে দেখাতে না পারি তবে দেশ ছেড়ে চলে যাব। তিনি বলেন, আমি কোর্সের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্‌ ও রসুল দেখার ব্যবস্থা করি। (বাংলা পত্রিকা, ১৪ জানুয়ারী ২০০০) নাউজুবিল্লাহ্‌।

মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সত্যিকারভাবে অনুশীলন না করায় আমরা বিপথগামী হয়ে ধর্মের খোলস নিয়ে হুংকার দিয়ে থাকি। তাই আজ স্বদেশে প্রয়োজন সত্যিকার ধর্মীয় শিক্ষার। সৌদি আরবস্থ প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ কাজে এগিয়ে আসতে পারেন বৈকি!!

মণীষী উপাখ্যান

শিশু -কিশোর বন্ধুদের জন্য

সে অনেক দিন আগের কথা। স্কটল্যান্ডের এক দরিদ্র কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছিলো। হঠাৎ সে শুনতে পেলো একটি শিশুর করুণ কান্না আর কাকুতি। কাছে দিয়ে দেখলো পাশের গোবর ও লতাপাতার পচা ডোবাতে একটি ৮/১০ বছরের বালক ভয় ও উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে আছে। কৃষকটি কোনভাবে তাকে সেখান থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলো। ছেলেটি তখন মৃতপ্রায়। ছেলেটিতে কেউ চিনে না জানে না। ঠাণ্ডায় তার চেহারায় সবুজাভ রেখা পড়ে গেছে।

কিছুদিন পর সেখানকার এক অতি ধনবান ও প্রভাবশালী বড়লোক *নোবলম্যান* এক বিরাট অশ্বসজ্জিত গাড়িতে সোয়াড় হয়ে সেই কৃষকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ইনি হচ্ছেন ডোবায় কুড়ে পাওয়া বালকের বাবা। তিনি দরিদ্র কৃষককে এক বস্তা মুদ্রা দিয়ে বল্লেন, ছেলেকে বাঁচিয়েছ সেজন্যে এ সামান্য উপহার তোমার জন্য। যদি তুমি ইহা গ্রহণ করো তাতে আমি খুবই খুশি হবো। দরিদ্র কৃষক উত্তরে বললো- মহামান্য, আমাকে মাফ করবেন, আমি এ উপহার গ্রহন করতে পারবো না। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি। *নোবলম্যাল* এর ছেলে বয়সী কৃষকের ছেলেটি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনছিলো। তার গায়ে জীর্ণবস্ত্র, চোখে-মুখে নিদারুণ দারিদ্রের ছাপ।

কৃষকটি যখন কোনভাবেই *নোবলম্যান* এর উপহার নিতে চাচ্ছিলো না, তখন তিনি ঐ দরিদ্র ছেলেটিকে বল্লেন, দেখো হে কৃষক, তুমি দরিদ্র। তুমি তোমার ছেলেকে পড়াশোনা করাতে পারছো না। তা আমি বুঝতে পারছি। যখন তুমি আমার এতোবড় উপকার করলে মানে আমার ছেলেকে বাঁচালে আমি তার প্রতিদান হিসেবে তোমার ছেলেকে ইংল্যান্ডের সর্বোত্তম স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।

কৃষক তাতে রাজী হয়ে গেলো। দরিদ্র কৃষকের ছেলে তৎকালীন ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ট স্কুলগুলোতে পড়াশুনা করে পরবর্তীতে নামকরা ডাক্তার হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন পেনিসিলিন এর আবিস্কারক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

দরিদ্র বাবার মতো তিনিও সারা জীবন মানুষের উপকার করে গেছেন। তবে ডোবাতে পড়ে থাকা মৃতপ্রায় সেই ছেলেটি কে তোমরা কি জানো? পরবর্তীতে তিনিই হচ্ছেন ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ট প্রধানমন্ত্রী *নোবল লোরেট* স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল। পরিনত বয়সে যখন তিনি নিমোনিয়া রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হন তখন তাঁর বন্ধু স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তাকে পেনিসিলিন ইনজেকশন দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ও পর্যটন শিল্প

বাংলাদেশ প্রধানত: চারটি উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। এগুলো হচ্ছে প্রথমত: রপ্তানী, দ্বিতীয়ত: প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ, তৃতীয়ত: বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান এবং চতুর্থত: বৈদেশিক বিনিয়োগ বা ঋউও বাংলাদেশ গেল ৩০ বছরে অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭,৭১০ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে ১৭,৯৭৯ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪৮% ভাগ হচ্ছে অনুদান এবং বাকী ১৯,৭৩১ মিলিয়ন.....বা ৫২% ভাগ হচ্ছে ঋণ- যার সুদ ও আসল জনগনকে পরিশোধ করতে হবে। বিভিন্ন গবেষনায় প্রকাশ যে, এই বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের শতকরা ৭৫% ভাগই দুর্ণীতিতে নষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলার কিছু সংখ্যক দুর্ণীতিপরায়ন আমলা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদী, অসৎ ব্যবসায়ী ও স্বল্প সংখ্যক বিদেশী ফড়িয়াদের পেটে চলে গেছে। এত তোড়জোড় করে যে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান সংগ্রহ করা হলো, দেশকে এবং জনগনকে জিম্মি রেখে যে ঋণের পরিমান সংগ্রহ করা হলো তার সিংহভাগই দুর্ণীতিতে চলে গেলে বাকী থাকে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ ঋণ ও অনুদানের বার্ষিক সত্যিকার প্রয়োগ হচ্ছে ৩১৪ মিলিয়ন ডলার বা দেড় হাজার কোটি টাকা।

আর এই দেড় হাজার কোটি টাকার জন্যে দেশের তাবৎ মন্ত্রনালয়, সরকারী ও আধাসরকারী দপ্তর বা বিভাগ সমুহ হন্নে হয়ে ছুটছেন বছরের পর বছর। উপজেলা থেকে শুরু করে খোদ্ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কিভাবে অধিকতর ঋণ ও অনুদান সংগ্রহ করা যায় তার জন্যে দিবারাত্রি প্রজেক্ট প্রোপোজেল তৈরীতে মহাব্যস্ত। কারো কোন সময় নেই এ সম্পর্কে ভিন্নভাবে ভাববার! ১ নং স্মরণীতে বাংলাদেশ বিভিন্ন সরকার আমলে কতটাকা ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায় তা দেখানো হলো। এতে দেখা যায় যে, ১৯৭১-৭৫ সালে অনুদানের পরিমান ছিল শতকরা ৬১% ভাগ এবং বার্ষিক সর্বমোট অনুদানের পরিমান ছিল ৩৬২ মিলিয়ন ডলার।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনুদানের পরিমান শতকরা ৪৭% ভাগে স্থির থাকে। তবে ১৯৯১-৯৬ অনুদানের পরিমান বাড়লেও পরবর্তী সরকারে অর্থাৎ ১৯৯৬-০১ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৩% ভাগে।

১ নং স্মরণী
বছর প্রাপ্ত অনুদান % প্রাপ্ত ঋণ % সর্বমোট(ঋণ+অনুদান) বার্ষিক অনুদান বার্ষিক ঋণ

(মিলিয়ন ডলার)

১৯৭১-৭৫	১৩২৪	৬১%	৮৬০	৩৯%	২১৮৪	৩৬২	২১৫
১৯৭৫-৮১	২৬২৮	৪৭%	২৯৪১	৫৩%	৫৫৬৯	৪৩৮	৪৯০
১৯৮১-৯১	৬৯৭৭	৪৭%	৭৭২৮	৫৩%	১৪৭০৫	৬৯৮	৭৭৩
১৯৯১-৯৬	৩৯১২	৪৯%	৪১১৫	৫১%	৮০২৭	৭৮২	৮২৩
১৯৯৬-০১	৩১৩৮	৪৩%	৪০৮৭	৫৭%	৭২২৫	৬৩৮	৮১৭
সর্বমোট ১৯৭১-০১	১৭,৯৭৯	৪৮%	১৯,৭৩১	৫২%	৩৭,৭১০	৫৯৯	৬৫৮

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, পৃ: ১৮৫-১৮৯
ঋণের কথা বাদ দিলে উক্ত স্মরণীতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ গড়ে বার্ষিক ৬০০ মিলিয়ন অনুদান পেয়ে থাকে এবং ঋণ ও অনুদান উভয় মিলে ১,২৫৭ মিলিয়ন ডলার পেয়ে আসছে। এখানে বলে রাখা সঙ্গত যে, ঋণ ও অনুদানের "অঙ্গীকার" কিন্তু অনেক বেশী প্রায় ৪৬,০৬৩ মিলিয়ন ডলার- তহবিল ব্যবহারে দীর্ঘসূত্রিতা ও অদক্ষতা থাকায় মোট অঙ্গীকারের প্রায় ১৮% ভাগ বা ৪৭হাজার কোটি টাকা ব্যয়িত হয়নি।

রপ্তানী বানিজ্য বাবদ আয়

১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল অর্থাৎ এই দশ বছরে বাংলাদেশ সর্বমোট ৪১,৪১০ মিলিয়ন ডলারের সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে এবং এর মধ্যে ৪,২৬০ মিলিয়ন ডলার আয় হয় প্রাথমিক বা প্রাইমারী পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করে এবং বাকী ৩৭,১৫০ মিলিয়ন ডলারের আয় হয় শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী থেকে। বস্তুত: শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানীর প্রায় ৭৪% ভাগ আসে তৈরী পোষাক, নীট ওয়ার ইত্যাদি রপ্তানী থেকে। গেল কয়েক বছরে দেশের প্রায় ৯১% ভাগ রপ্তানী আয় হচ্ছে শিল্পজাত পণ্য বাবদ -
(২নং স্মরণী দ্রষ্টব্য)

২নং স্মরণী:

রপ্তানী আয় ১৯৯১-২০০১

(মিলিয়ন ডলার)

			বার্ষিক	২৫%	গড় বার্ষিক
১৯৯১-৯৬	১,৮৫৭	১৩%	২৮৮৪		৭১৪
১২,৪১১	৮৭%	১৪,২৬৮			
১৯৯৬-০১	২,৪০৩	৯%	৫,৪২৪		১,৩৫৭
২৪,৭৩৯	৯১%	২৭,১৪২			
সর্বমোট		৪,২৬০	৪,১৪১		১,০৩৫
৩৭,১৫০		৪১,৪১০			
(১৯৯১-০১)					

* প্রাথমিক পণ্য: চা, কাঁচা পাট, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজ পণ্য, অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ
** পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, বিটুমিন, তৈরী পোষাক, নীট ওয়ার, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য পণ্য।
তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২ পৃষ্ঠা # ১৮৬

২নং স্মরণীতে দেখা যাচ্ছে যে, গেল ১০ বছরে (১৯৯১-২০০১) বার্ষিক গড় রপ্তানী আয় হচ্ছে ৪,১৪১ মিলিয়ন ডলার। এই রপ্তানী করার জন্যে বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানী করতে হয়। বিশেষ করে তৈরী পোষাকের ক্ষেত্রে কাপড়, সুতা, বোতাম, বক্রম- সবকিছুই আমদানী করতে হয়। এসব আমদানী ও বিভিন্ন খরচ বাবদ ৭৫% ভাগ আয় ব্যায় হয়ে যায়। তাহলে শতকরা ২৫% নীট আয় ধরে নিলে বার্ষিক নীট গড় রপ্তানী আয় হচ্ছে মাত্র ১,০৩৫ মিলিয়ন ডলার।

বৈদেশিক বিনিয়োগ বা FDI

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান হতাশাব্যাঞ্জক। এর মুল কারণ অবকাঠামোর অভাব, আমলাতন্ত্র ও লাল ফিতার দৌরাত্ম, সন্ত্রাস, বানিজ্যিক আইনকানুনের দুর্বলতা তদুপরি রয়েছে হরতাল, অবরোধ, শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ করে আইন শৃংখলার যথেচ্ছাচারিতা। এসব কারণে বাংলাদেশে শ্রমিকের বেতন কম হওয়া সত্বেয় উপরি খরচ বা দঞৎধহংধপঃরড়হ পড়ংঃ অত্যন্ত বেশী - হিসাবে দেখা গেছে যে ঘুষ, লালফিতার দৌরাত্ম, আইনকানুনের জটিলতা, ইউটিলিটি সংগ্রহে বাড়তি খরচ ইত্যাদি মিলে যে জিনিসটির উৎপাদন এক টাকা হওয়া উচিত তা পাঁচ টাকায় দাঁড়ায়। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। তবে সুখের কথা যে, বাংলাদেশে বৈদেশিক

বিনিয়োগের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। তার প্রমান বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থার (ইঙও) তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত 'নিবন্ধিত' মোট বিনিয়োগের পরিমান ছিলো ১০,০৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০১ সালে ১৬ মিলিয়নে পৌছে। এর মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগের নিবন্ধনকৃত পরিমান ৯,৫৩১ মিলিয়ন ডলার। 'নিবন্ধনকৃত' বিনিয়োগের পরিমান দেখলে বলতেই হয় যে, বিনিয়োগের আগ্রহ প্রচুর রয়েছে। তবে সত্যিকার বিনিয়োগের পরিমান বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী শতকরা ১% ভাগও কার্যকরি হয়নি।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য দেশে নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের ৭০% থেকে ১০০% ভাগ কার্যকরি হয- বাংলাদেশে ইউনিডর মতে ০.৩% ভাগ মাত্র। চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পোলান্ড, চেকোস্লাভাকিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে বিনিয়োগের হার হচ্ছে ৭০% থেকে ১০০% ভাগ। গেল বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের আগ্রহও কমে গেছে। বাংলাদেশে ২০০১ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান ৭২% ভাগ কমেছে বলে ঢাকায় প্রকাশ। আয়কর, ব্যাকিং ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে যথেচ্ছাচারিতা ও সন্ত্রাস চলছে তাতে স্বদেশে বৈদেশিক এমনকি স্বদেশী বিনিয়োগও হ্রাস পেতে পারে। এখানে উলেখ্য যে, আমলা নির্ভর শাসন ব্যাবস্থা বাংলাদেশে এতই প্রবল যে ওখানে কেউ বিনিয়োগ করতে সাহস পায় না। এর ফলে পাশাপাশি সবক'টি রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে সবচেয় কম। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার এমনকি নেপাল থেকেও বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ কম। এখানে উলেখ্য যে, প্রতি মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগে বাংলাদেশে গড় প্রতি ২৩০টি নতুন চাকরি সৃষ্টি হয় এবং সে হিসাবে যদি নিবন্ধনকৃত ১৬ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হতো তাহলে প্রায় ৩৭ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টি হতো- এ বিষয়টি কি কেউ ভেবে দেখবেন?

প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা

বিভিন্ন তথ্য মতে বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ লক্ষ জনগন প্রবাসে রয়েছেন এর অধিকাংশই হচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী। সরকারী তথ্যমতে ১৯৮২ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ২৯ লক্ষ জনগন প্রবাসে চাকরির জন্যে গমন করেন, তবে এর থেকে কতজন ফিরে এসেছেন তার হিসাব দেয়া হয়নি। এ বিরাট সংখ্যক লোকের প্রায় অর্ধেক মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন। সৌদি আরবে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ প্রবাসী রয়েছেন বলে অনেকের ধারণা। এই প্রবাসীরা ১৯৮২ থেকে ২০০১ সালে সর্বমোট ২১,৫৮৩ মিলিয়ন ডলার সরকারী মাধ্যমে পাঠিয়েছেন (৩নং স্মরণী দ্রষ্টব্য)। গেল কয়েক বছরে এদের বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের পরিমান ২বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। গেল বছরে সৌদী আরবের প্রবাসীরা ১,১১৪ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা সরকারী মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং দেশের সর্বমোট প্রবাসী প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার এ হচ্ছে ৪৭% ভাগ। (বেসরকারী বা হুন্ডির মাধ্যমে আরো ২৫% থেকে ৩০% ভাগ মুদ্রা প্রেরিত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।) এর আগের বছরে তাদের প্রেরিত অর্থের পরিমান ছিল ৪৯% ভাগ। সৌদী আরবে বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে বাংলাদেশীদের সংখ্যা প্রায় ১৫% ভাগ এবং গেল বছর সৌদী আরব থেকে ২১,০০০ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে যায়। সে হিসাবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের হোম রিমিটেন্সের পরিমান মাত্র ৫% ভাগ। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশীদের বেতন কম, এদের প্রায় ৯৮% ভাগই ক্লিনার্স, জেনিটার বা শ্রমিক। তবে আনন্দের কথা যে, এই অদক্ষ শ্রমিকদের অনেকেই আজ

সুন্দরভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত- নিজেদের অদম্য আগ্রহ, দক্ষতা ও মেধার কারণে আজ এসব নিম্ন

বছর	প্রবাসীদের সংখ্যা	হোম রিমিটেন্স (মিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক রিমিটেন্স (মিলিয়ন ডলার)
১৯৮২-৯২	৬৯০,০০০	৫,৯৩৬	৬৬০
১৯৯১-৯৬	৯৯৬,০০০	৫,২৯৯	১,০৬০
১৯৯৬-০১	১,২০২,০০০	১০,৩৪৮	২,০৭০
সর্বমোট	২,৮৮৮,০০০	২১,৫৮৩	৩,৭৯০

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০২

বেতনের অনেকেই দেশের ধনী লোক, বড় বড় ব্যবসায়ী।

৩নং স্মরণী:

প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা ১৯৮২ - ২০০১

পরিসংখ্যানের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রবাসীদের বার্ষিক প্রেরিত অর্থের পরিমান সর্বোচ্চ বার্ষিক গড় ২,০৭০ মিলিয়ন ডলার। এই একই সময়ে বার্ষিক গড় অনুদান ছিল ৬২৮ মিলিয়ন ডলার (১নং স্মরণী) ঋণের পরিমান ছিল ৮১৭ মিলিয়ন ডলার, বার্ষিক গড় নীট রপ্তানীর পরিমান ছিল ১,২৫৭ মিলিয়ন ডলার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমান যৎসামান্য। অর্থাৎ প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণের পরিমান সর্বোচ্চ হওয়া সত্ত্বেয় এদের অবস্থা বড্ড সংকটময়- তাচ্ছিল্য, নির্যাতন ও সামাজিক যাতনা ও ঘৃনায় এদের জীবন ভরপুর। তাদের অধিকাংশের সংসারই তথৈবচ।

সম্প্রতি ইতালীতে গিয়ে দেখলাম বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেরা, এম-এ, বি-এ পাশ করা যুবকরা ঐদেশে বিভিন্ন ধরণের ছবি, সোভিনিয়ার, ফুল, বাদাম ইত্যাদি হেটে হেটে বিক্রি করছে এবং ওরা জানালো যে, প্রতিরাতে গড়ে ১০০ইউরো বা প্রতিমাসে পাঁচ লাখ টাকা আয় হয়। ইটালীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত জিয়াউদ্দিন আহমেদ স্বদেশে টাকা প্রেরণের জন্যে ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছেন এবং এখানের প্রায় ৭০ হাজার প্রবাসী যাদের অর্ধেক হচ্ছে অবৈধ তাদের বৈধ করার জন্যে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছেন দেখে প্রীত হলাম। তার দুতাবাস সকল বাংলাদেশীদের জন্যে উন্মুক্ত এবং তিনি যেহেতু ওদের উপকার করতে চাচ্ছেন তার ফলে তার অধীনস্থ সকল আমলারাও জন-মন-পন।

এমন অবস্থা বাংলাদেশের অন্যান্য দুতাবাসে বিশেষ একটা দেখা যায় না। বরং রিয়াদ ও সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশস্থ দুতাবাসে যত ধরণের আইন কানুন দেখানো সম্ভব তার কোন শিথিলতা দেখা যায় না।

যেমন দেড় দিনের বাসে চড়ে প্রায় ৮/৯শত কিলোমিটার দুর হাফার আল বাতেন থেকে এক ভদ্রলোক ৭টি বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে আসেন রিয়াদে – পাসপোর্টগুলো রিনিউ করার জন্যে। বেচারা যে এতদুর থেকে এসেছেন তার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখানো হয়নি। তাকে দু'সপ্তাহ পরে আসতে বলা হলে সে অতদুর থেকে আবার বাংলাদেশ দুতাবাসে ফিরে আসে সেই রিনিউ করতে দেয়া পাসপোর্ট গুলো নেয়ার জন্যে। লোকটির সঙ্গে দুতাবাসেই পরের বারে দেখা হয়ে গেল তাই জানতে পারলাম এমন ঘটনা। পাসপোর্ট রিনিউ চার্জ অর্ডিনারী হলে সময় এক সপ্তাহ লাগবে এবং আর্জেন্ট হলে একদিন পর- এ আইনের কোনো শিথিলতা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় এখানে কোন বাংলাদেশীর মৃত্যু হলে 'নো অবজেকশান' সার্টিফিকেট নিতে। নো অবজেকশান সার্টিফিকেট না পাওয়ায় মাসের পর মাস অনেক বাংলাদেশীর লাশ এদেশের মর্গে বা হাসপাতালের ফ্রিজে পড়ে রয়েছে- এদের কেউ কি হিসাব রাখে!?

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা দিয়ে বিষয়টি খোলাসা করা যাক। এক সৌদী কর্ণেলের বাড়িতে মান্নান নামের এক জামালপুরের ছেলে গৃহভৃত্তের কাজ করতো। কর্ণেলের একজন ড্রাইভার প্রয়োজন হলে মান্নান তার দেশের একটি যুবককে ড্রাইভারের চাকরি নিতে সাহায্য করে। ২৬ বছরের টগবগে যুবক ড্রাইভার মুজিব। সে ফ্রি ভিসায় এসেছিল। একুশদিন কাজ করার পর হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়। ঐ সময় ছিল রমজান মাস। সৌদী পরিবার তখন মক্কায়। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে কর্ণেল সাহেব ফিরে আসেন বাড়িতে। তখন মান্নান জানালো যে, তার লাশ দেশে পাঠানোর প্রয়োজন নেই, এখানেই কবর দেয়ার জন্যে ওর বৃদ্ধ বাবা জানিয়েছেন। রমজান মাস তাই কর্নেল সাহেব তাকে পাঁচ হাজার সউদী রিয়াল দান ও ৯০০ সউদী রিয়াল ২১দিনের বেতন বাবদ দিবেন বলে দুতাবাসে বলেন। আর যায় কোথায়! দুতাবাস দাবী করে যে, রাষ্ট্রদুতের নামে ৫,৯০০ রিয়ালের ব্যাংক ড্রাফট দিলে তারপর তাকে 'নো অবজেকশান সার্টিফিকেট' দেয়া হবে। মান্নান কর্ণেল সাহেবকে বুঝালো যে, যদি দুতাবাসকে টাকাটা দেন তাহলে মুজিবের বাবা ঐ টাকা সহজে পাবে না। সুতরাং তার বাবার একাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো দরকার। মান্নানের বক্তব্যে সত্যতা রয়েছে- কারণ অনেকেই তাদের মৃত আপনজনের টাকা কোনদিনই পায় না। এ ভাবে প্রায় ৭ কোটি টাকা জমে রয়েছে বলে প্রকাশ। কখনও কখনও ঐ সব মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের টাকাগুলো বড় বড় কর্তা ব্যক্তিরা বিভিন্ন এন-জি-ও তৈরী করে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সৌদি কর্ণেলের বড় ভাই আমার দপ্তরে কাজ করেন। তিনি জানালেন যে, সেই লাশটির মৃত্যু হয়েছে মাস দেড়েক আগে- এখনও দুতাবাস থেকে এন,ও,সি পাওয়া যায়নি যার ফলে ঐ লাশটি মর্গে পড়ে রয়েছে। কর্ণেল সাহেব বহুদুরে বদলী হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে দুতাবাসে প্রতি সপ্তাহে যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। বিষয়টি শুনে কর্ণেলের ভাইকে নিয়ে রাষ্ট্রদুতের সাথে দেখা করি। রাষ্ট্রদুত জানালেন- ৫,৯০০ রিয়ালের ড্রাফট না দিলে এন, ও, সি দেয়া সম্ভব নয়। মৃত ব্যক্তির পাওনা হচ্ছে ৯০০রিয়াল মাত্র- পাঁচ হাজার হচ্ছে খয়রাত। রাষ্ট্রদুত এতে অবিচল। ঘটনা শুনে কর্নেল সাহেব বলেন যেহেতু তিনি মুজিবকে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করেছেন, সুতরাং একে দেশে পাঠানো বা এর লাশ দাফন তার দায়িত্ব নয়। তিনি তার প্রাপ্য বেতন নয়শত রিয়াল দিয়েই চলে যান। অন্যদিকে মৃত মুজিবের আসল কফিলকে পাওয়া যাচ্ছেনা। মান্নানের ধারনা ঢাকার ফকিরাপুলের একটি আদম ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সে এসেছিল। এভাবে প্রায় তিন মাস পার হয়ে যায়। পরে দুতাবাসের লেবার এটাচী মোস্তাফিজুর

রহমান সাহেবের সাথে ঐ বিষয়ে যোগাযোগ হলে তিনি জানালেন যে, আপনি যদি লিখিতভাবে এর দায়-দায়িত্ব নেন তাহলে নয়শত রিয়ালের একটি ড্রাফট দেন এবং বাকী পাঁচ হাজার ডাইরেক্টলি পাঠান। তাহলে ছাড়পত্র দেয়া যায়।

ওনাকে বলাম যা লিখার আপনি লিখে দেন আমি সই করে দেব আর এই নিন নয়শত রিয়ালের ড্রাফট। মুস্তাফিজুর রহমানের কারনে শেষ পর্যন্ত তিন মাস পর লাশটি দাফন করা সম্ভব হয়। এই হচ্ছে বাংলাদেশী দুতাবাসের বাইবেলের মতো আইন এবং এর রাষ্ট্রদুত!

গেল সপ্তাহে শুনলাম প্রায় ৩০/৪০ টি বাংলাদেশী লাশ এন, ও, সি র কারনে মর্গে পড়ে রয়েছে কয়েক মাস থেকে। সত্যি মিথ্যে যাচাই করিনি। এ জন্যে দু'দুবার দুতাবাসে ফোন করে উত্তর পাইনি এখনো। রাষ্ট্রদুতের পি-এ মেসেজ রেখেছেন বার বার।

পর্যটন শিল্প

যা বলতে যাচ্ছিলাম সে কথায় আশা যাক। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে চারটি প্রধান দিক আলোচিত হলো এর মধ্যে বৈদেশিক অনুদানের পরিমান দিন দিন বিশ্বজুড়ে কমছে- এবং কমতেই থাকবে বলে মনে হয়। সুতরাং রপ্তানি আয় এবং 'এফডিআই' বাড়ানোর জন্যে বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। 'এফডিআই' এবং রপ্তানী আয়ের মধ্যে পজিটিব সম্পর্ক রয়েছে- 'এফডিআই' বাড়লে রপ্তানিও বাড়ে। চীন, মালয়েশিয়া, আয়ারল্যান্ড এর উদাহরন।

তাছাড়া যে বিষয়টির উপর জোর দেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে 'পর্যটন'। এ বিষয়টি বাংলাদেশে এক্কেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে বলে মনে হয়। ৪নং স্মরণীতে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের আয় তুলনামুলকভাবে সর্বনিম্নে মাত্র ৫০ মিলিয়ন ডলার যা দেশের বার্ষিক আমদানী খরচের মাত্র ০.৬% ভাগ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে পর্যটন শিল্পের আয় সে দেশের বার্ষিক আমদানীর ১৪% ভাগ। আর মালদ্বীপের কথা বাদই দিলাম। ওখানে পর্যটন শিল্পের আয় বার্ষিক আমদানীর অধিক। এ শিল্পজাত আয় থেকে আমদানীর খরচ শুধু মেটানোই নয়, বহু লোকের অন্ন সংস্থানে পথ সৃষ্টি তা থেকে হয়েছে।

স্মরণী ৪:

বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্পের আয় ১৯৯৯-২০০০

দেশ	পর্যটন বাবদ বার্ষিক আয় (মিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক আমদানী খরচ (বিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক আমদানী খরচ যা পরিশোধ করে পর্যটন আয় %
ইতালী	২৮,৩৬০	২০৬	১৪ %
জামাইকা	১২৩০	২.৭	৪৬ %
লেবানন	৮০৭	৫.৭	১৪ %
মালদ্বীপ	৩৩৪	০.৩১২	১০৭ %
মরক্কো	১৯৬০	৯.৫	২১ %
নেপাল	১৬৮	১.২	১৪ %
মিশর	৩৯৩০	১৫.৮	২৫%
গ্রীস	৮৭৭০	২৭.৭	৩২%
আইসল্যান্ড	২০৭	২.৪	৯%
ভারত	৩০৪০	৫০.২	৬%
বাংলাদেশ	৫০	৮.০	০.৬%

তথ্যসূত্র : ওয়ার্ল্ড আল মানাক, ২০০২ ও টুরিজম ওয়েব সাইট।

বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ - শিখ এবং নাথদের বহু ধর্মীয় প্রাচীন উপাসনা কেন্দ্র রয়েছে- যেমন সিলেটের নাথ ধর্মাবলম্বীদের পরম গুরু মীন নাথের আশ্রম রয়েছে যা বর্তমানে 'মিনারের টিলা' নামে পরিচিত- জনগনের কবর গাঁ। নারায়নগঞ্জে রয়েছে 'লাঙ্গাল বন্ধ' কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা

ভবন চত্ত্বরে রয়েছে শিখ ধর্মাবলম্বীদের 'গোরদোয়ার'। তাছাড়া কুমিলায় রয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষু। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটকে রয়েছে বহু ধর্মের বহু প্রাচীন নিদর্শনা। এগুলোকে সংরক্ষণ করে ব্যবসায়িকভিত্তিতে প্রচারণা চালালে ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া, মায়ানমার ইত্যাদি দেশ ছাড়াও বহুদেশ থেকে ধর্মাবলম্বীরা বাংলাদেশে বেড়াতে আসতে পারেন এগুলো দেখার জন্যে। সরকারকে এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। ফিজিতে দেখেছি ছোট ছোট দ্বীপে বাংলাদেশের মতো আদ্র গ্রীস্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , কানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশগুলো থেকে হাজার হাজার পর্যটকদের হলাহল। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে শত শত ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে যেগুলোতে পর্যটন শিল্প অত্যন্ত সুনিপুন ও লাভজনক ভাবে চালু করা যেতে পারে। খোলা আকাশের নিচে নির্জন দ্বীপে কট্টর রৌদ্রে পশ্চিমাদের শুইয়ে থাকা ফিজির অন্যতম আকর্ষন।

বস্তত: বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে সরকারকে অধিকতর সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন। আজকের বাংলাদেশে বিশেষ করে শাসক মহলে বিরোধীদলকে ঘাত-প্রতিঘাত ও ধ্বংস করার রাজনীতি এবং বিশ্ব ব্যাংক ও অর্থ তহবিলগুলোকে তোষামোদী ছাড়া সরকারের অন্যবিদ কোনো কর্ম আছে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় ও মন মানসিকতার পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন। তা নাহলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অধিকতর অর্জন এবং চাকরির সংস্থানের জন্যে নতুন দিকদিগন্তের সম্ভাবনা খোঁজা প্রয়োজন বোধ করি। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে বাংলাদেশ যদি জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই বাংলাদেশী সার্মারিক বাহিনী ইরাকে পাঠায় এবং ওরা যখন স্বদেশীদের (ইরাকীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তখন সারাটি মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের অবস্থান খারাপ হতে পারে যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহে বাংলাদেশী শ্রমিক গ্রহনে অনিচ্ছুক হতে পারে। এতে করে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমান কমে যেতে পারে বৈকি! এজন্যে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত {উীঃবহফবফ গরফফষব উধংঃ ঞৎধফব ঞৎবধঃ] বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ফ্রি বানিজ্য চুক্তি সংস্থার সদস্য হবে কিনা তা বিশদভাবে বিশেষন করে মতামত দেয়া প্রয়োজন বোধ করি। তবে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্যে 'অগ্নিপরীক্ষা' হাতছানি দিচ্ছে।

রিয়াদ

লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতিবিধ এবং কলাম লেখক

১৫/৭/২০০৩

সমাপ্ত

E-mail: marupalash@gmail.com